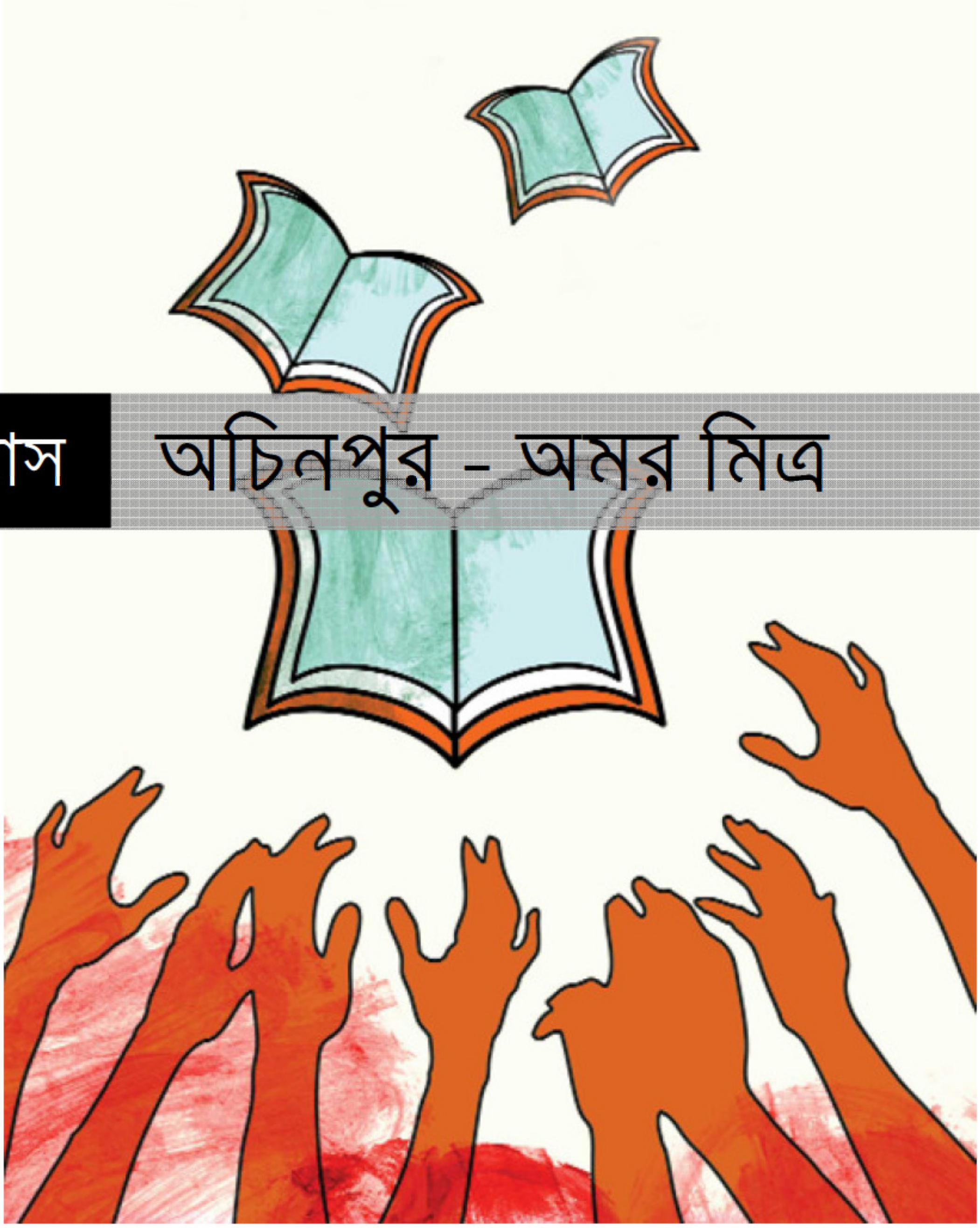


উপন্যাস

অচিনপুর - অমর মিত্র

উপন্যাস

অচিনপুর

অমর মিত্র

এখনো আমি চোখের সামনে দেখতে পাই জাহ্নবী নদী আর অচিনপুর।

আমরা, আমি আর সুনন্দা ছিলাম অচিনপুরে, জাহ্নবী নদীর তীরে। আমি গিয়েছিলাম চাকরি করতে। স্টেট সার্ভিসের অফিসার, কত ক্ষমতা আমার। জীবনের আরম্ভ তখন। মনে হয়েছিল, এই জীবনকে আমি ধন্য করেছি। তিন বছর ব্লক অফিসার হয়ে যখন জাহ্নবী নদীর কূলে এলাম, আমি মনে করেছিলাম, এমন জীবন কে পায়? আমাদের সবার ওপরে জেলা শাসক। তিনি বলতেন, চাকরি করতে এসেছ, তোমার হাতে অনেক ক্ষমতা, তাকে কখনো ভুলভাবে ব্যবহার করো না।

কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, তা নির্ণয়ের ভেতরেই এ-জীবনে মানুষের সকল সফলতা। জেলা শাসক ভার্মা সায়েব, তারপর লোকনাথ মল্লিক সায়েব কী একটা কথাই দুরকমভাবে বলেছিলেন? ভার্মার পর এসেছিলেন মল্লিক সায়েব। এখন কখনো মনে হয়, ক্ষমতা - পাওয়ারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল সহকর্মী মজুমদার। এখন এই শান্ত হয়ে থাকা জীবনে, ব্যালকনিতে বসে মজুমদারকে মনে পড়ে খুব। আশ্চর্য, মজুমদারকে কি আমরা কেউ কখনো ভালো চোখে দেখেছিলাম? ভালো চোখে দেখার মতো মানুষ ছিল সে? থাক মজুমদার, লোকনাথ মল্লিক সায়েব জেলা শাসক হয়ে এলেন আমাদের সেই যৌবনকালের অচিনপুরে। তাঁর তখন মধ্য যৌবন পার। স্টেট সার্ভিস থেকে জেলা শাসক, প্রশাসনে তাঁর অতুল অভিজ্ঞতা, তাঁর কথা

শুনি মুগ্ধ হয়ে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনান, তাঁর জ্ঞানের কথা শোনান, তাঁর মূল্যবান মতামত দেন - সব কথাই ধ্রুব সত্য মনে হয়।

শোনো বাসু, শোনো, লাইফটাকে এনজয় করতে হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসতে হবে তোমাকে, একদিন সব পাওয়ার হবে আমাদের, পলিটিশিয়ানদের কাছ থেকে একদিন সব পাওয়ার আমরা নিয়ে নেব, ডে'জ উইল কাম সুন, যেভাবে দেশ চলছে, চলতে পারে না।
আমাদের সেই জেলা শাসক মি. মল্লিক বলতেন, পাওয়ার অ্যান্ড পাওয়ার, একদিন পিপল বলবে, নো পলিটিশিয়ান, নো পলিটিক্স, কিন্তু পাওয়ার তো কেউ না কেউ নেবে, কে নেবে, শোনো বাসু, পাওয়ার হচ্ছে বিউটিফুল উইম্যান, সি কান'ট লিভ অ্যালোন, সে কারো না কারো কাছে যাবেই, হু উইল এনজয় হার? ব্যুরোক্র্যাটস।
এখন মল্লিক সায়েবের কোনো খবর পাই না। শুনেছিলাম, অবসরের পর তিনি কোনো একটা বড় কোম্পানির অ্যাডভাইজার ছিলেন। তারপর ইলেকশনে দাঁড়িয়ে জিতেছেন। আমি সমস্ত জীবন আমার মতো করে ক্ষমতা এনজয় করেছি। যার যতটুকু ক্ষমতা, তা ব্যবহার করেই সে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারে। আমিও তো স্টেট সার্ভিসে ছিলাম। সরকারের কেরানিরও ক্ষমতা কম নয়। যে কেরানির যত বুদ্ধি, সে তত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। একজনকে দেখেছিলাম, সে আমাদের মজুমদার, প্রমোশনে প্রমোশনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জেলার কর্তা আর ওপরওয়ালাদের সার্ভিস দিয়ে দিয়ে তার ক্ষমতা হয়ে গিয়েছিল অসীম। মজুমদারই শেষ কথা। মজুমদারকে ধরলে ডিএম-এডিএমরা সব কাজেই হ্যাঁ করেন। মজুমদারকে আমরা ঈর্ষা করতাম। আড়ালে বলতাম, ডিএমের ঝাড়ুদার। মজুমদার তা জানত, হাসত, বলত, আমি জানি কী করছি, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট মানে ওপরওয়ালার সার্ভেন্ট, এটা সকলেই জানে, কিন্তু সার্ভিস

দেওয়ার ক্ষমতা সবার নেই।

সেই মজুমদার এখন কোথায়, জানা নেই। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, রোগাটে গড়ন, ধূর্ত দুটি চোখ, সাজ-পোশাকে সব সময় ফিটফাট, শীতের সময় দামি স্যুট, গরমে দামি কাপড়ের হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার্স, ভোরবেলা থেকে তার কাজ আরম্ভ হতো। কালেক্টরেটের একটি গাড়ি তার সঙ্গে জুড়ে থাকত সেই ভোর থেকে। মজুমদার সেই গাড়িতে চেপে সায়েবদের ঘুম ঠিক হয়েছে কি-না, সেই খোঁজ নিতে বাংলোয় হাজির। 'গুড মার্নিং স্যার, বলে দিয়েছিলাম সকালের ভেতর যেন আপনার বাংলোয় গরু নিয়ে এসে সামনে দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়, বাচ্চার দুধ, ভেজাল হলে ফাটকে ভরে দেব।' বলতে বলতে মজুমদার হাসতে থাকে। সায়েব অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভার্গব, বিহারে বাড়ি, আইএএস। বাচ্চার দুধের জন্য একটি গরু কিনে নেবেন বলেছিলেন, মজুমদার তা সংগ্রহ করে দেবে বলেছিল, কিন্তু সায়েবের সুন্দরী স্ত্রী না করেছেন, গরু রাখা যাবে না বাংলোর পেছনে, তাহলে পরিবেশ নষ্ট হবে। অগত্যা সেই মজুমদারই ভরসা। সায়েবের একটিই সন্তান, তাঁর ইচ্ছা গরুর খাঁটি দুধ খাওয়াবেন তার পুত্রকে, মজুমদার ব্যবস্থা করেছে। ক্ষমতা অর্জনের একটি পথ মজুমদার আমাদের দেখিয়েছিল।

এখন মজুমদার কোথায়? আমার মতো সব ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে কি বাড়ির ব্যালকনিতে বসে থাকে দিনভর? নিঝুম নগরের পড়ন্ত বেলা চোখে নিয়ে দিন কাটায়? একা একা। দিন পার করে সন্ধ্যা, রাত্রি।

আমার ছেলে আমেরিকায় সেটল করেছে। থাকে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের সান দিয়েগো শহরে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সেই শহর। আমি ইন্টারনেটে দেখেছি, চারশো বছর আগে স্পেনীয়রা প্রথম ওই উপকূলে জাহাজ নোঙর করে। ক্যালিফোর্নিয়ার পুব দিকে সান দিয়েগো। ছেলের সঙ্গে কোনো কোনো রোববার ইন্টারনেটে কথা হয়। ওর ঘর

দেখা যায়। ও আর বউমা দুজনে এঘর-ওঘর করে, ল্যাপটপ নিয়ে। চোদ্দোতলা থেকে নিচের শহর দেখা যায়। যদি আমি সকালের ভেতর থাকি, ওরা আগের দিন রাতে। দীপাবলির আলোর মালায় সেজেছে সেই শহর। খোলা জানালা দিয়ে ওদের ঘরে প্যাসিফিকের বাতাস ঢোকে, কী সেই হাওয়া। আমাদের ঘরে এসেও ঢোকে যেন। তোলপাড় করে দেয় মন। আমি কি কখনো ভেবেছিলাম এই রকম। মেজমাসির বড় ছেলে সুবীরদা যখন চলে গেল লানডনে (আমরা বলতাম লন্ডন, ছেলে বলেছে ওটা হবে লানডান), কী রকম ছোট না লেগেছিল নিজেকে। আমাদের সাতপুরুষের কেউ বিদেশ যায়নি, যাবেও বলে মনে হয় না। সুবীরদা গিয়েছিল বিলেতের হাসপাতালে চাকরি করতে। ফিরেও ছিল বছর দুই পরে পাকাপাকিভাবে। নিজের দেশ ছেড়ে, মা-বাবা-ভাইবোনকে ছেড়ে বিদেশে মন বসেনি। বড় অফার পেয়ে ও-দেশে থাকা সাব্যস্ত করেও থাকেনি। সে ফিরে এলে আমার বাবা, সুবীরদার ছোট মেসো বলেছিলেন, ঠিক করেনি সুবীর, বিলেতে থাকলে অনেক বড় হতে পারত। ওটা ইংরেজের দেশ, ও-দেশে এখনো রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আছেন। ওদের সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না একসময়, আবার ওদের সুদিন ফিরবে।

সে আমাদের ছোটবেলার কথা। কত বয়স হবে তখন, বারো-তেরো। মনে হয়েছিল, ঠিক কথা বলেছে বাবা। এখনো তাই মনে হয়। কিন্তু মন তো খারাপ হয়। কতদূরে ছেলেটা। আমাদেরও বয়স হচ্ছে। এখন ছেলেবউ, নাতি-নাতনি নিয়ে দিন কাটাবার সময়। বাবা বলতেন, ইন্ডিয়ানরা কি দেশ শাসন করতে পারে, ওদেরই আবার ডাকতে হবে তা জানে সায়েবরা, ওদের দেশে গুণীর কদর আছে। সুবীর খুব ভুল করল।

সেই সুবীরদা এখন ব্যাঙ্গালুরু ছাড়িয়ে গিয়ে কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রের সীমান্তে সেই লাতুর জেলার কিল্লারি গাঁয়ে চিকিৎসা করেন। কোন লাতুর জেলা? আঠারো বছর আগে

ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল যেখানে, সেই লাতুরের কথা বলছি। সে একটা কথা। আমার বন্ধু সুবিমল খবরের কাগজে আছে। সাংবাদিকতা তার কাজ। সে অযোদ্ধায় গিয়েছিল '৯২-এর ডিসেম্বরে। তার রিপোর্ট ছিল অসম্ভব ভালো। সে লাতুর গিয়েছিল ১৯৯৩-এর অক্টোবরে। পুজোর ঠিক আগে আগে। লাতুরের রিপোর্টে সে এক বাঙালি ডাক্তারের কথা লিখেছিল, সুবীর ভদ্র। কর্ণাটকের প্রত্যন্ত গাঁয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় চালায়, পুরো ইউনিট নিয়ে ভূমিকম্পপীড়িত এলাকায়। আমি ওর লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়ে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম সুবিমলের সঙ্গে। সুবিমল আমার খোঁজ নিয়ে বলেছিল, সে আসবে ওই জেলায় তার সাংবাদিকতার কাজেই। আমি তখন কলকাতা থেকে দূরে উত্তরবঙ্গের এক জেলায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অনেক দপ্তরের ভার আমার ওপর। জেলা শাসক এক মধ্যবয়সী সিভিল সার্ভিসের অফিসার। মানুষটির অনেক গুণ। নিরামিশাষী উত্তর-ভারতীয়রা যে বলে, মছলিখোর বাঙালি কী করে হিন্দুত্ব রেখেছে, তা তিনি সমর্থন করেন। সুবিমল আমার কোয়ার্টারে এসেছিল জেলা কভার করতে এসে। বলেছিল, মানুষটার জন্য গর্ব হয় বিপুল, মনে হলো জীবনের একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন ওখানকার ডাগদারসাব।

আমি আর সুনন্দা অবাক হয়ে সেই রূপকথা শুনেছিলাম। শুনতে শুনতে সুনন্দা বলেছিল, তুমি হাটেবাজারে বলে একটা সিনেমা দেখেছ সুবিমলদা, বনফুলের উপন্যাস, অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যয় ছিলেন।

কে দ্যাখেনি সেই সিনেমা, বনফুল নিজে ডাক্তার ছিলেন, ওই ডাক্তারকে উনি নিশ্চয় দেখেছিলেন, কিন্তু সিনেমার চেয়েও ওই ডাক্তারের জীবন আরো কালারফুল, বিলেত থেকে ফিরে এসেছিলেন গরিব দেশবাসীর চিকিৎসা করবেন বলে, মূলত শিশুদের দ্যাখেন, বড়দেরও দেখতে হয়।

সুবিমল অনেক কথা বলেছিল সেই ডাক্তারকে নিয়ে। আমাকে তাঁর ফোন নম্বর দিয়েছিল সে-ই। সুবিমলকে নিয়ে আমি জেলা শাসকের কাছে গিয়েছিলাম। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সুবিমল ভূমিকম্পপীড়িত লাতুর জেলার কথা শুনিয়েছিল তাঁকে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কফি নিয়ে ঘণ্টা দেড় আড্ডা হয়েছিল। নামী সংবাদপত্রের সাংবাদিক। তাকে তো খাতির করতে হয়। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জেলা উৎসবে। সেই উৎসব হতো বর্ণাঢ্য। তার জন্য খরচও হতো দেদার। জেলার বড় বড় ব্যবসায়ী অকৃপণ হাত বাড়িয়ে দিতেন। শীত ওখানে চমৎকার। উৎসবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। কলকাতা থেকে ট্যুরিস্টের ভিড় হতো। আদিবাসী নৃত্য, ভাওয়াইয়া থেকে নানা লোকসংগীত, লালনের গান, রবীন্দ্রনাথের গান, শাস্ত্রীয় সংগীত - সব হতো। চিত্রতারকাদের নিয়েও অনুষ্ঠান হতো। আগে অতটা বড় করে হতো না। মল্লিক সায়েব জেলার ভার নেওয়ার পর উৎসব বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। সত্যসন্ধানী সুবিমল অনাহারী গ্রাম নিয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট করেছিল। উদাসীন জেলা প্রশাসনের অজ্ঞাতে-অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। আশ্চর্য, সুবিমল যে এই খবর করতেই এসেছিল আমাদের জেলায়, তা আমিও জানি না। কিন্তু তার পর থেকে মল্লিক সায়েবের ভালো নজর থেকে আমি সরে গেলাম।

এসব কতদিন আগের কথা। মল্লিক সায়েবকে আমি একটুও ভুলিনি। এখন এই প্রায় নির্জন বাড়িতে বসে চাকরিজীবন নিয়ে নানা কথা মনে পড়ে। তা ছাড়া কীই-বা মনে থাকবে। জীবনের সঞ্চয় তো ওইটুকু। আমার জীবনের দুটি কাজ, একটি আমার সন্তানটিকে মনের মতো করে তৈরি করা, অন্যটি হলো এই বাড়ি। সল্টলেক সিটিতে এই বাড়িটি করেছিলাম মনের মতো করে। বিধাননগরের চেয়ে সল্টলেক সিটি নামই আমার পছন্দ। ওয়াশিংটন সিটি - সিটি মনে হয়। কত কষ্ট করে এই বাড়ি করেছিলাম।

জমি জোগাড় করেছিলাম পুরনো সহকর্মী মজুমদার আর অফিসের এক অধস্তন কর্মচারীকে ধরে। তার ভগ্নিপতি সে-বছর রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। আমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে গিয়েছিল সে। বদলে তাকে অফিসের এমন ফাইল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার ভেতরে টাকা আছে। এ ব্যাপারে আমাকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। তাতে কী হয়েছে? ওই ফাইল যার হাতে যাবে, সে-ই টাকা নেবে, তাহলে ভবতোষ মিত্তির টাকা নিলে কী দোষ? কেউ না কেউ তো নেবেই। কিন্তু আগে টাকা নাকি ভাগ হতো, ভবতোষ সেইটা বন্ধ করে দিলো। সে একাই নিতে লাগল। তখন ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। এক বছরের বেশি ওই ফাইল যেন না দেওয়া হয় কাউকে। বদলে বদলে। সকলেই সুযোগ পাক। আমার বদলি হয়ে গেল সেই সময়। জমি পেয়ে তা রেজিস্ট্রি করে পজিশনও পেয়ে গেছি।

সুতরাং বদলি। আমার বদলে যিনি এলেন তাকে আমি বলে এলাম, ওই অর্থকরী ফাইল ঘুরিয়ে সকলের হাতে দিতে।

সেই বাড়িতে আমরা এখন দুজন। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার বউ বুড়ি হয়েছে। আগের মতো আর খাটতে পারে না। আগের মতো আর উৎসাহ প্রকাশ করতে পারে না। সারাজীবন ও-ই আমাকে চালিয়েছে, এখন বলে কিছুই ভালো লাগে না। আমাদের একটি নাতনি হয়েছে, তার এখন চার বছর। রয়েছে সেই সাতসাগরের ওপারে। তাকে দেখছে এখন বউমার মা-বাবা, এরপর যাব আমরা। পালা করে যাওয়া স্থির হয়েছে। অপেক্ষা করছি কবে যাব বিদেশে। কিন্তু আমার বউ বলছে, যাবে না। কেন যাবে না? ওর এখন কিছুই ইচ্ছে করে না। চুপচাপ বসে থাকে। এমনিতেই ও খুব খেয়ালি। ওর মন খারাপ অনেকদিন থেকে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে?

ও বলল, কিছু হয়নি।

তাহলে চুপ হয়ে গেলে কেন?

কী করব চুপ করে না থেকে?

কিছু একটা হয়েছে তোমার।

না, কিছু হয়নি। বলে সুনন্দা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি ব্যালকনি থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একটা বুড়োমতো লোক আসছে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে। রোগা, মাথার চুল শাদা। জিন্স আর রঙিন চেক শার্ট। এ-পাড়ার লোক বলে মনে হয় না। বাড়ির নম্বর খুঁজছে মনে হয়। একটা লোককে জিজ্ঞেস করছে কিছু। খোঁজ নিচ্ছে কোনো বাড়ির। আমি দেখতে দেখতে ভাবি, আমাদের বাড়ি এলে ভালো হয়। কতদিন আমাদের বাড়ি তেমন লোক আসে না। টেলিফোন হওয়ায় মানুষের যাওয়া-আসা কমে গেছে। আমরাও তো তেমন একটা যাই না কোথাও। এখন মানুষের চলন কমে গেছে মনে হয়। টিভিও তার কারণ একটা। বেড়াতে গিয়েও মানুষ ঘরে আটকে থাকে এসব নিয়ে। টেলিভিশনের সিরিয়ালের চরিত্ররাই এখন আমাদের ঘরে এসে বসে। কথা বলে, গান গায়, কাঁদে-হাসে, প্রেম ও কলহ করে। আমরা তা নিবিষ্ট হয়ে দেখি। শেষ হলে বলি, রূপসী আর একটু থেকে যাও। সে থাকে না, তখন অন্যরা আসে, অন্য সংসারের অন্য গল্প নিয়ে।

দোতলার এই ব্যালকনিতে বসে কতদূর দেখা যায়। প্লটটি একদম মনের মতো করে নির্বাচন। সামনেটা খোলা মাঠে, তার গা দিয়ে রাস্তা গেছে বাস-রাস্তার দিকে। সুনন্দা কখনো এসে বসে, বেশিরভাগ সময় আমি একা। এই যে সুনন্দা ছিল, এখন উঠে গেছে বাগানের গাছে জল দেবে বলে। তারপর কম্পিউটারের সামনে বসবে। ইন্টারনেট খুলে সান দিয়েগো পৌঁছে যাবে।

দুই

মল্লিক সায়েব বলতেন, বাবরি মসজিদ ভেঙে ঠিক করেছে রামভক্তরা, এ-বিষয়ে তাঁর মতামত খোলাখুলি। তা, সন্ধের আড্ডায় তিনি বলেন, অধীনস্থ ডেপুটিরা ঘাড় কাত করে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করে। এটিই দস্তুর। তখন কালেক্টরেটের সদরে কোনো মুসলমান ডেপুটি ছিলেন না। তিন সাব-ডিভিশনে দুজন। আমি চুপ করে থাকতাম। মনে হতো ঠিক নয়, এসব ঠিক নয়। কিন্তু আমি ওই কথার বিপরীতে কোনো কথা বলার সাহস রাখতাম না। আবার পক্ষেও কিছু বলতাম না। বুদ্ধিমান জেলা শাসক তা লক্ষ রাখতেন। আমি জানতাম, জেলা শাসকের ভালো-মন্দ লেখার ওপর আমার চাকরির ভবিষ্যৎ। আমার প্রমোশন, আমার বদলি, আমার পোস্টিং - সব। মল্লিক সায়েব বলতেন, তাঁরা দুই ভাই ও এক বোন। তিনি ছোট, তাঁরা সকলেই প্রশাসনে আছেন। বড় ভাই ফরেন সার্ভিসে, তাঁরা ভাইবোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে। বোন আইএএস, বোনের হাজব্যান্ডও তাই। স্টেট সার্ভিসে তাঁর র্যাংক ছিল প্রথম। কথায় আমি সাড়া দিতাম না বলে তিনি আমাকেই শোনাতেন সব, ব্যুরোক্র্যাটরাই একদিন সব পাওয়ার ভোগ করবে, তারাই শাসন করবে।

ইয়েস স্যার।

অ্যাবসলিউট পাওয়ার পেলে আমরাই দেশটাকে ঠিকঠাক রাখতে পারব।

ইয়েস স্যার। মজুমদার বলত, হয়ে যাবে স্যার, পলিটিশিয়ানদের কেউ বিশ্বাস করে না।

মজুমদার, আমার ভাগ্নি আসবে, তুমি স্টেশনে যাবে রিসিভ করতে।

ম্যাডাম যাবেন নাকি স্যার?

জিজ্ঞেস করো ম্যাডামকে, আমার ভাগ্নি এবার বসেছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, র্যাংক করেছে নাইনটি এইট, এবার ইন্টারভিউ। আমি বলেছি, রাজস্থান কিংবা পঞ্জাব

ক্যাডার অপশন দিতে, ওদিকে ব্যুরোক্র্যাটরা অনেক বেশি পাওয়ার এনজয় করে।

ইয়েস স্যার। মজুমদার বলল, আপনার ফ্যামিলিই দেশ শাসন করছে।

আমাদের ফ্যামিলি ব্যুরোক্র্যাসিটা জানে।

ইয়েস স্যার।

তুমি জানো না তোমার পাওয়ার কোথায়, কতটা পাওয়ার তুমি হোল্ড করো। জানলে তুমি ওইটাকে ব্যবহার করে আরো পাওয়ার অ্যাকোয়ার করতে পারবে।

মজুমদার বলল, জানি স্যার, রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে হোটেলের রিসেপশনে কার্ড শো করাতে, সে কী খাতির স্যার, আমাকে একটা গাড়িই দিয়ে দিলো সব সময়ের জন্য। আমরা জানতাম, মজুমদার পারে। মধ্যপ্রদেশ গিয়ে সাগরজেলার কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বান্ধবগড় ফরেস্ট ঘোরার জন্য সরকারি গাড়ি অ্যালট করে নিয়েছিল। কালেক্টরের ঘরে ঢুকে এমন স্যার স্যার করতে লাগল, তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই মানুষটি পরে ইলেকশনের অবজারভার হয়ে পাশের জেলায় এলে মজুমদার সাময়িক বদলি নিয়ে সেই জেলায় চলে গিয়েছিল। ইলেকশনের সময় এমন হয়। জেলার পুরনো অফিসারদের বদলি করে দেওয়া হয় কমিশনের আদেশে। মজুমদার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে দামি সিল্ক। আমাদের শহরের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেওয়া। সেই সায়েবের সঙ্গে তাঁর গৃহিণীও এসেছিলেন।

সুনন্দা ফিরল ব্যালকনিতে, বলল, ভালো লাগছে না।

জল দেওয়া হয়ে গেল?

মালি ছেলেটা কাল সকালে আসবে, আজ না দিলে হবে।

একটা দিন শুকিয়ে থাকবে?

থাকুক, গাছ-টাছ আমি রাখতে পারব না, আমার ভালো লাগছে না।

কতবার বলেছে ছেলে-বউ, চলো ঘুরে আসি।

সুনন্দা চুপ করে থাকে। আমি বললাম, গান নিয়ে বসতে পারো তো।

কী জানি, কেন ভালো লাগে না। ওই একটা লোককে দেখছ।

হু, কত লোক তো রয়েছে, কোনজন?

এদিকে আসছে, ও কে?

কী করে জানব কে, আমাদের বাড়ি তো আসছে না।

আসতেও তো পারে। সুনন্দা বলল, চেনা মনে হয়।

আমি তো চিনতে পারছি না।

দেখো, আমাদের বাড়িই আসবে।

আমি জানি, আমাদের বাড়ি আসবে না। আমাদের বাড়ি অনেকদিন কেউ আসে না।

বউমার বাপের বাড়ি বর্ধমানে। কলকাতায় এলে আসেন তাঁরা কখনো-সখনো। আসলে মেয়ে থাকলে আসতেন, মেয়ে নেই কার কাছে আসবেন। তাঁরাও একা হয়ে গেছেন। তবে ওটা জেলা শহর। ওই শহরের আদি বাসিন্দা তাঁরা। আত্মীয়স্বজন সব আশপাশে। বিশ মাইল দূরে দামোদরের ওপারে তাঁদের গ্রাম, গ্রামেও যাওয়া-আসা আছে। আমাদের গ্রাম নেই। আছে এই নতুন শহর, পঞ্চাশ বছরও বয়স হয়নি যার। এই শহর এখনো অচেনা হয়ে আছে আমাদের কাছে। সুনন্দা এই ব্যালকনিতে এসে দূরের পথচারী দেখে প্রায়ই কল্পনা করে, আমাদের বাড়ি আসছে কেউ। কিন্তু কল্পনা একবারও সত্য হয়ে ওঠেনি এখনো।

জেলা শাসকের ভাগ্নি, বছর সাতাশ-আটাশের প্রখর যুবতী শ্রেয়া চৌধুরীকে রিসিভ করতে মজুমদার গিয়েছিল। সঙ্গে দুজন অর্ডারলি। জেলা শাসকের ভাগ্নি শ্রেয়া রূপবতী, কদিন বাদেই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে,

তাঁকে মজুমদার নিজের হেফাজতে নিয়ে নিলো। ম্যাডামের দেখাশোনা করবে সে। ম্যাডামকে জেলাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে। অর্ডারলি দুজন, যাদব আর মাধবকেও মজুমদার তার হেফাজতে নিয়ে নিয়েছিল ছোট ম্যাডামের খিদমত খাটার জন্য। শ্রেয়া চৌধুরী যখন বিশ্রাম নেন, মজুমদার তার চেম্বারে আসে। তাঁর চেম্বারে আমরা ভিড় করি। মজুমদারের ভাগ্য কী! এই ভাগ্য সে নিজেই অর্জন করেছিল। কেউ কেউ বলতে শুরু করল, যতক্ষণ ছোট ম্যাডাম না ঘুমোবেন, মজুমদার ডিউটি দিয়ে যাবে। আমি তাঁকে দেখেছিলাম দূর থেকে। মাথায় মজুমদারের চেয়ে উঁচু, পাঁচ ফুট, সাত ইঞ্চির মতো হবে, গায়ের রঙে আশ্চর্য লাবণ্য, মাজা মাজা রং, মাথাভরা চুল, বেৎসগাছের মতো টানটান দেহ, আভিজাত্য রয়েছে। হালকা নীল শাড়ি, হালকা নীল ব্লাউজ। সে উঠল গাড়ির পেছনে, সঙ্গে বড় ম্যাডাম, মিসেস মল্লিক। মজুমদার ড্রাইভারের পাশে। একদিন দেখলাম, গাড়ির পেছন থেকে নামল শ্রেয়া চৌধুরী একা। মজুমদার ড্রাইভারের পাশ থেকে। জেলা কালেক্টর - ডিএমের বাংলো কালেক্টরের অফিসের লাগোয়া। তবে প্রাচীরে ঘেরা। বড় গেটের মুখে সেন্ট্রি রাইফেল উঁচিয়ে। ভেতরে টেনিস কোর্ট, বাগান, বড় বড় কটি গাছ। সব ব্রিটিশের রেখে যাওয়া। ব্রিটিশের যে যে উত্তরাধিকার আমরা সযত্নে রক্ষা করছি, তা হলো প্রশাসনিক রীতিনীতি, দেশ শাসনের আইন-কানুন। যে-আইনে ব্রিটিশ সরকার এদেশ শাসন করত, সে-আইনই বলবত রয়েছে স্বাধীন দেশে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, শ্রেয়া চৌধুরী আমাদের অফিসের দিকেই আসছেন। তাঁকে পথ চিনিয়ে চিনিয়ে আসছে মজুমদার, ইয়েস ম্যাডাম, এই দিকে, মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাডাম, ওয়েলকাম টু আওয়ার অফিস। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, এই কথা বলতে বলতে মজুমদার শ্রেয়া চৌধুরীকে এডিএম মি. ভার্গবের চেম্বারে নিয়ে গেল। ভার্গব সেই মানুষটি, যার বাংলোয় গরুর

খাঁটি দুধ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে মজুমদার। ভেতরে মিস শ্রেয়া চৌধুরীকে রেখে মজুমদার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমি ডাক দিলাম, মজুমদার, আমাদের দিকে একটু তাকাও।

মজুমদার এগিয়ে এলো, ম্যাডাম বেরোলে আমাকে খুঁজবেন।

আরে, ভার্গব সায়েব তোমার ম্যাডামকে এখন ছাড়বে না।

মজুমদার ঘড়ি দেখল, বিড়বিড় করল, দুটোয় লাঞ্চ।

এখনো অনেক দেরি, তুমি চঞ্চল হচ্ছো কেন?

মজুমদার চুপ করে থাকে। তখন আগস্ট মাস। বর্ষা কদিন বন্ধ। একটা গুমোট ভাব চারদিকে। মজুমদারকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভার্গবের মিসেস তো পটনা।

হ্যাঁ। মজুমদারের কণ্ঠস্বর ম্রিয়মাণ।

দেখো, বড়সায়েব যে-দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালন করো ঠিকঠাক করে।

মজুমদার চুপ। ভার্গব ছয় ফুট উঁচু, মস্ত দেহ তার। ঈষৎ লাল চোখ দুটি বনবন করে ঘুরছে সব সময়। মহিলা অফিসার তানিয়া সেন ভার্গবের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল আমার কাছে, নতুন এডিএমের চোখ ভালো নয়। তানিয়া জেলা থেকে বদলি হয়ে গেছে।

মজুমদার একটু পরে বলল, উনিই তো বললেন মি. ভার্গবের কাছে যাবেন, বড় সায়েবের সামনেই তো বললেন। সায়েব বললেন নিয়ে আসতে।

মিস শ্রেয়া চৌধুরী বেরিয়ে এলেন এক ঘণ্টা বাদে। ছুটে গেল মজুমদার। তরুণীর চোখ-মুখ ঝলমল করছিল, হাসি-হাসি মুখখানি। এরপর নিয়ম করে প্রতিটি দিন তাঁকে নিয়ে আসতে লাগল মজুমদার। তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে মজুমদার আমার ঘরে এসে বসে থাকে। আমি বললাম, বড় বড় সায়েবের বড় বড় ব্যাপার, তুমি না বড় সায়েবের রোষে পড়ে

যাও মজুমদার, তুমি তোমার যে-ডিউটি নিয়েছ, তা খুব রিস্কি, ভার্গবের ঘরে আচমকা ঢুকে পড়তে পারবে?
উনি পছন্দ করবেন না, ইন্টারকমে যোগাযোগ করার অর্ডার আছে।
কথা উঠবে মজুমদার, তানিয়া সেনকে ঘরে ডেকে কাজের অছিলায় আটকে রাখত ভার্গব সায়েব, তোমার মনে নেই, অশ্লীল গল্প জুড়ত, তানিয়া বলেনি?
মজুমদার বলল, সায়েব যা বলবে, তা আমাকে করতে হবে বাসু, উনি কদিন বাদেই জয়েন করবেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, তখন কী হবে?
কী হবে মজুমদার?
মজুমদার বলল, তুমি বুঝতে পারছ না বাসু, উনি অপশন দিয়ে এই স্টেটেও আসতে পারেন, পারেন কি-না।
তাতে তোমার কী?
মজুমদার বলল, ওই উনি বেরোলেন, উনি ইন্টারভিউর জন্য রেডি হচ্ছেন, ওঁর কাছে সে-কারণেই আসেন, ভার্গব সায়েবের র্যাংক ছিল ঊনআশি।
ছোট শহর। এ-শহরে গোপন কিছু থাকে না। অফিসে ফিসফাস আরম্ভ হয়ে গেল। একদিন নাকি ভার্গবের বাংলোর বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদারকে, ভেতরে ডিএমের ভাগ্নি আর ভার্গব। আমরা চুপচাপ। বড় সায়েবের কানে গেলে অনর্থ হবে। মজুমদারের চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমাকে বলেছিল, ভাগ্নির দেহরক্ষী হতে, তুমি তাকে কার কাছে ঠেলে দিয়েছ? ভার্গব মেয়েখোর, আর সে মেয়েই বা কী, ভার্গবের পাল্লায় গিয়ে পড়ল!
মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সায়েব-ম্যামদের ব্যাপার তাঁরা বুঝবেন। আমার ডিউটি আমি করব, বাসু।

জেলা শাসক ‘বাসু’ বলেন, তাই মজুমদারও। আমি বললাম, তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ। ও মেয়ে ফুর্তি করে তোমার নামে দোষ দেবে, তুমিই তাঁকে নিয়ে গেছ ভার্গবের কাছে। ভার্গব বড় অফিসার, ওর কিছু হবে না, ওদের কিছু হয় না, ফাঁসবে তুমি আঁচল না ছুঁয়েও।

মজুমদার বুদ্ধি ধরে। শেষে কদিন বাদেই একদিন সকালে লোকাল নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে গেল। মজুমদারের চেনা ডাক্তাররা বলল, সত্যি, মজুমদার সায়েবের হার্টের দপদপানি বেড়ে গেছে, সাতদিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। জেলা শাসক তার খোঁজ নিলেন, বুঝেছিলেন নিশ্চয় সবটা। তাঁর কানে কি যায়নি? এরপর শ্রেয়া চৌধুরী ফিরে গেলেন জীবনের পাঠ নিয়ে। মজুমদার নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেল আরো কদিন বাদে।

তিন

সুনন্দা বলল, তোমার সেই সুবীরদা কোথায়?

কী করে জানব?

আমরা যদি অমনি হতে পারতাম! পারতে তুমি?

আমি বললাম, যে যেমনভাবে জীবন কাটায়, আমি মনে করি না ওই জীবন খুব আনন্দের। সুবীরদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই করল না, আমার ছেলেও তো সানদিয়েগোতে থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।

ছেলের বিয়ের সময় অনেক কষ্টে ফোন নম্বর জোগাড় করে এক রাতে ফোন করেছিলাম সুবীর ভদ্রকে। কথা বলা যায়নি। রোগীর বাড়িতে বসে আছেন তখন। ধরেছিলেন এক মহিলা, খুব সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়। ওই টানে ইংরেজিতে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে, বলতে তিনি জানালেন, ডক্টরবাবু পেশেন্টের বাড়ি, ফিরলে সব

বলা হবে, উনি রিং ব্যাংক করবেন আমাকে, বলতে বলতে কেটে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য ফোন আর আসেনি। সুবীরদা হয়তো শুনে খুশি হননি যে আমার ছেলে অভিরূপ ক্যালিফোর্নিয়া থাকে। মামা-মাসিদের পরিবারের ভেতর সুবীর সরকার সবচেয়ে মেধাবী, সে-ই প্রথম বিদেশযাত্রা করেছিল। তারপর শুনেছিলাম, বড় মাসির নাতনি গেছে। ওদের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই।

যাক, এসব কথা কি আর নতুন। এ তো সব পরিবারে আছে। মেসো আক্ষেপ করতেন, সুবীর অত মেধাবী হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে এলো। আরো দুঃখের কথা, পড়ে থাকল কর্ণাটকের মফস্বলে। আমার ছেলের বিদেশ যাওয়া যখন সেটল হলো, মেসো আমাকে বলেছিলেন, যেন ফিরে না আসে, এদেশে থেকে কারোর কিছু হবে না। জীবনকে যদি ভোগ করতে হয়, ওই আমেরিকা-ইংল্যান্ডে যেতে হয়। সত্যিই তো, আমরা কী করলাম এ জীবনে? যা আনন্দ, তা যেন ছেলেকে দিয়েই পূরণ করে নেব। ওকে বিদেশ পাঠাব, এ আমাদের পণ ছিল। দুজনেই ত্যাগ করেছি অনেক কিছু। আমার বউয়ের গলায় কতটা না গান ছিল, সে ছেড়েই দিলো সব।

আমেরিকা থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। খুব ধুম হয়েছিল তখন। বিনা পণে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। বিয়েতে কোনো উপহার নিইনি। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই ছিল প্রার্থনীয়। লোকে ধন্য ধন্য করেছিল। ছেলে যেমন আমার একটি, বউমাও বাপ-মায়ের এক মেয়ে। গান জানা মেয়ে। ওদেশের বঙ্গ সম্মেলনে গায় শুনেছি। প্রশংসাও পায়। আমরা যা করেছি, সব পাবে তারা। মানুষ শুধু নিজের সুখের জন্য জীবনপাত করে না, তার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, সাতপুরুষ যাতে সুখে থাকে, তার ব্যবস্থাও পারলে করে রাখে। সাতপুরুষের জন্য টাকা-পয়সা, ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে যায়। তবে আমরা আর কী দেব ওদের। আছে যে ঢের। এর ভেতরে যা সঞ্চয়, তা

আমাদের সারা জীবনে হয়নি।

আজকাল সুনন্দার সঙ্গে তেমন কিছু কথা হয় না। সেও বলে না, আমিও বলি না। সে টিভির সামনে বসে থাকে, আমিও। নানা রকম উত্তেজক খবর আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ভোটের আগে, ভোটে কী হতে পারে - তা নিয়ে আমরা খুব মগ্ন থাকতাম। যে যে চ্যানেলে পার্টি নিয়ে খুব কোন্দল হতো, সেই সেই চ্যানেল নিয়ে পড়ে থাকতাম। সুনন্দা অবশ্য এরই ভেতর একটা গানের চ্যানেলেও শিফট করত। রবীন্দ্রসংগীত শুনত অনেক সময় ধরে। ও কম্পিউটারে বসলে টিভি আমার। তখন আমি নিশ্চিন্ত হতাম। আমাদের নিস্তব্ধ-নিরুত্তাপ জীবনে টেলিভিশনের ওইসব কোঁদল, খুন-জখমের বিবরণে একটু উত্তাপ আসত। আমি আমার উত্তেজনা প্রকাশ করতাম, বউ চুপ করে থাকত। কখনো কখনো ও উত্তেজিত হয়ে যে উঠত না, তা নয়। সেই যে এক বিডিওর মৃত্যু নিয়ে নানা মত, ওপরওয়ালার চাপে সে আত্মহত্যা করেছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছে - এ নিয়ে আমাদের দুজনের ভেতরে মতানৈক্য প্রবল। তার মত হলো, যা-ই হোক, ওই সৎ বিডিওকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যার দায় ওর ওপরওয়ালা এড়াতে পারেন না। আমার মত তার বিপরীত। আমি সেই বড় কর্তা প্রশাসনের পক্ষে। বিডিও ছেলেটির উচিত ছিল বড় কর্তার মত অনুসরণ করা। আমার জীবনে কি আমি সব কাজ ঠিকঠাক করেছি, জানি করিনি। তাতে কি আমি বেঁচে নেই?

বিডিও তো অন্যায় না করেই মরেছে। আমার বউ সুনন্দা বলে।

তাহলে অন্যায়টা করতেই পারত। আমি বলি। আমার কথায় সুনন্দা রেগে যায়। এভাবে আমাদের দিন যায়। এমনও হয়, অনেকটা সময় আমরা বসে আছি একা। কেউ কোনো কথা বলছি না।

সেই লোকটা আমার বাড়ির কাছে। কেমন চেনা লাগছে। হাঁটার ভঙ্গি চেনা। কে যেন,

কার কথা মনে পড়ছে যেন। না, সে হবে কী করে? আমি ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। অনেকদিন বাদে আমাদের বাড়িতে একটা লোক এলো মনে হচ্ছে। না হতেও পারে। এই সেদিন বৈশাখী নামের বাড়িটা থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল অনুপম, আমার সহকর্মী। এগোতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, অনুপম সুর বছরখানেক আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমার চেয়ে বছর সাত-আট ছোট ছিল ও। হইহই করে বাঁচতে ভালোবাসত। চমৎকার ছিল গানের গলা, গাইত মহম্মদ রফির গান। গাতা রাহে মেরে দিল... কী টান না দিতে পারত অনুপম, সুনন্দা ওর সঙ্গে গলা মেলাত। রফি আর লতা। একদিন হলো গাইড সিনেমার সব গান, কাঁটো সে খিঁচ কি অাঁচল... আহা কৌন হে তেরা মুসাফির জায়েগা কাঁহা - শচীন দেবও গাওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজে পড়ে বুঝেছিলাম সেই অনুপম, বারাসাতে অতিরিক্ত জেলা শাসক হয়েছিল। আমি সুনন্দাকে খবরটা দিইনি। কাগজটাই সরিয়ে রেখেছিলাম। টিভির চ্যানেল বদল করে দিয়েছিলাম। কেন তা, আমি জানি না। একদিন বিকেলে ব্যালকনিতে বসে দেখলাম, লোকটি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, লোকটা আমাদের বাড়িই এসেছে। প্রায় বুড়ো, কিন্তু ঠাটেবাটে বেশ। মাথার চুল ঘন কালো, ডাই করা বোঝা যায়। জিনস, চেক হাওয়াই শার্ট, পায়ে দামি সু। পকেট থেকে উঁকি মারছিল দামি সিগারেটের প্যাকেট। তাকে চিনলাম, তুমি মজুমদার না? তখন বেলা পাঁচটার মতো। গ্রীষ্মের দিন, তাই রোদ বেশ। মজুমদার বলল, আমাকে যে চিনতে পারবে তা ভাবিনি, অচিনপুরে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

হ্যাঁ, মেদিনীপুরেও। এসো, ভেতরে এসো।

মেদিনীপুরে তুমি ডেপুটি, আমি জয়েন্ট বিডিও।

অচিনপুরে তুমি ডিএমের কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

মজুমদার হাসে, ডাক দেয়, ম্যাডাম কেমন আছেন, আপনার ছেলে তো আমেরিকায়। জানতাম, এদেশে থাকার নয়, আমার জামাই থাকে ইংল্যান্ডে।

নিচে বসার ঘর। অতিথির জন্য সুন্দর করে সাজানো। নরম গদিতে বসতে বসতে মজুমদার বলল, ঠিকানাটা ছিল তোমার ছেলের বিয়ের কার্ডে, বিয়েতে আসতে পারিনি, কার্ডটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম বলে আসতে পারলাম। দাদা, ম্যাডাম এখনো গান করেন?

তুমি রিটায়ার করে গেছ?

রি-এমপ্লয়মেন্টে আছি, যতদিন পারি করব, করব নাই-বা কেন?

তা ঠিক, আমার আর ইচ্ছে করল না।

আমি তিন মাস বসেছিলাম, বসে বসে হাঁপিয়ে উঠলাম। বুঝলাম, পারব না, এত বছর চাকরি করলাম, এত চেনা, চিফ সেক্রেটারি পর্যন্ত, আমি তো সবাইকে সার্ভিস দিয়েছি, সবাই আমাকে লাইক করতেন, শেষে কি-না মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার, আমি করিনি।

ঠিক সেই রকম রয়েছে মজুমদার। তার বৃত্তান্ত বেশ লাগছে। বহুদিন বাদে সেই অফিস, ওপরওয়ালা, অধস্তন কর্মচারী, নানা প্রসঙ্গ ভেসে আসতে লাগল। পুরনো কথার স্বাদ আলাদা। ভালোই লাগছে। সুনন্দা একটু বসে, চা দিয়ে কিচেনে ঢুকে গেছে। বহুদিন বাদে মজুমদার এসেছে, তাকে কিছু ভালো-মন্দ খাওয়াবে। আমি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, সেই শ্রেয়া ম্যাডামকে মনে আছে বাসু, তোমার?

মুখ টিপে হাসলাম, বললাম, মজুমদার, তুমি ভার্গবকে সুযোগ করে দিলে।

মজুমদার বলল, মেয়েটি এখন দিল্লিতে, হোম মিনিস্ট্রিতে, সেবারেই আইএএস হয়েছিল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

তুমি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ মজুমদার, ভার্গব কোথায়?

ভার্গব সায়েব পটনায়, যোগাযোগ আছে। গিয়েছিলাম দেখা করতে, আমাকে পটনায় চাকরি দিচ্ছিলেন, ভালো সুযোগ ছিল, কিন্তু শেষ অবধি না করলাম। স্যার বলেছেন, যখন প্রয়োজন জানাতে, কলকাতায় এলে আমিই সব ব্যবস্থা করে দিই।

আমি টের পাচ্ছিলাম মজুমদার কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, মজুমদার ব্যাপারটা মল্লিক সায়েবের কানে গিয়েছিল?

মজুমদার বলল, কী কানে যাবে বলো তো?

ওঁর ভাগ্নি আর ভার্গব?

মজুমদার হাসে, বলে, তুমি ভোলনি তো!

না, কিছু কিছু কথা মন থেকে সরে যায় না।

তুমি জানবেই?

এখন জানলে কী হবে, হাই প্রোফাইল পারসন, ওদের কত ক্ষমতা, ওদের কাছে ওসব কিছুই না, লাইফটাকে পাওয়ার দিয়ে এনজয় করতে জানে ওরা।

ওরা এখন কে, কোথায়?

একজন দিল্লি, আর একজন পটনা। আরে, এসব ওঁদের কাছে জাস্ট এনজয়মেন্ট, নাথিং মোর। তারপর হয়তো ওদের আর দেখা হয়নি, দেখা হলেও হাই-হ্যালোতেই শেষ।

যোগাযোগ আছে তোমার?

হ্যাঁ, ভার্গব সায়েবের ছেলে খুব ব্রিলিয়ান্ট, ওকে আইএএস করবেন।

তাই তো হবে, বংশপরম্পরায় শাসনের একটা মোহ থাকে। ভার্গব সায়েবের বাবা বিহার স্টেট সার্ভিসে ছিলেন।

তুমি ভার্গবকে যা দিয়েছিলে, সে তোমাকে মনে রাখবেই।

সকলের মনে থাকে না, আর আমি তো ছিলাম পাহারাদার, ওরা দুজনেই যখন চাইছিলেন, আমি কী করব, বাসু?

বড় সায়েব তোমাকে জিজ্ঞেস করেননি?

মজুমদার মাথা নাড়ে, বলতে থাকে, শুনেছি, দুজনেই অস্বীকার করেছিল। ভার্গব ওকে ইন্টারভিউর জন্য তৈরি করেছিল, এতে সন্দেহের কী আছে। বাসু জগৎটাকে তুমি জানলে না, এসব কিছু না, আমার সামনে ওঁরা বনবাংলোয় সমস্ত দুপুর, আমি অন্য ঘরে ঘুমিয়েছি, মেয়েটিই ভার্গবকে টেনে নিয়ে ঢুকেছে হাসতে হাসতে।

তোমার খারাপ লাগেনি?

খারাপ লাগবে কেন, আমি সামান্য মানুষ, জয়েন্ট বিডিওতে ঘষে ঘষে শেষে প্রমোশনে ডেপুটি, তবে আমি ছয় মাস ব্লক করেছি, উঠে এসেছিলাম মল্লিক সায়েব, আমাদের ডিএমের সুপারিশে, ভার্গব তখন প্রথম এসেছে, আমি বুঝেছিলাম ক্ষমতার জন্য ক্ষমতাধারীর ছায়ায় থাকতে হয়। তুমি কী ভাবতে, আমি বলতে পারব না বাসু, কিন্তু আমি জানতাম প্রাইমারি টিচারের ছেলেকে আরো আরো উঠতে হবে, বাবাকে এক এসডিওর রক্ষী ঘাড় ধরে চেম্বার থেকে বের করে দিয়েছিল, বাবা বাড়ি এসে বিষ খান, তুমি কি এসব জানো বাসু?

চার

পরিবেশ থমথমে হয়ে গেল। মজুমদার এত বছর বাদে এলো কেন, তা আমি ধরতে পারছি না। শুধুই দেখা করতে? পুরনো কথা বলাবলি করতে? যে-কারণেই আসুক মজুমদার, সে-ই বলবে। ও বিষয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। সুনন্দা এলো, বলল, আপনি কি ড্রিংকস নেবেন?

ম্যাডাম আমার বন্ধ।

ছেলে এনেছিল, ও একা বলে খায়নি।

আমি বসে আছি, বাসু নিক, আপনি নিন।

সুনন্দা হাসে, আমার গা গুলোয়, পারব না।

তাহলে থাক, আমাকে বারণ করেছে, এক ড্রপও লিভারের পক্ষে বিপজ্জনক।

আপনি কি খেতেন?

মজুমদার বলল, সায়েবরা বসলে আমাকে থাকতে হতো, বসলে আমাকেও নিতে হতো, নিতে-নিতে লিভার গেল, দিল্লির এইমসে ছিলাম এক মাস, ম্যাডাম শ্রেয়া চৌধুরী সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, ওর জন্য বেঁচে গেছি, ভাজাভুজি খাই না, আপনি ভাববেন না, বসুন।

না, আপনারা গল্প করুন, বউমার ফোন আসবে একটু পরেই, ওপরে যাই। বলতে বলতে সুনন্দা উঠে গেল। মজুমদার বিড়বিড় করল, আসলে ওসব সায়েবদের জন্য তৈরি, আমাদের কি সহ্য হয় বাসু, বনবাংলোয় ওঁরা পাশের ঘরে, আমাকে হঠাৎ ডাকলেন ভার্গব সায়েব, মজুমদার, এই মজুমদার, হোয়ার আর ইউ মজুমদার।

মজুমদারের তখন ঝিমুনি এসেছিল ভরা ভাদ্রের দুপুরে। নিঝুম বনবাংলো। লাঞ্চ প্যাকেট তার সামনের টিপয়ে। সায়েব-ম্যাডাম ড্রিংক করে খাবেন। বড় একটা হুইস্কির বোতল সায়েবের হুকুমে এনেছে মজুমদার। তাঁরা দুজনে পাশের ঘরে। বনবাংলোর কর্মী বুড়ো সব ব্যবস্থা করে দূরে কোথাও আছে। হাঁক দিলেই সে এসে পড়বে। একটা কুবো পাখি ডেকেই যাচ্ছিল কখন থেকে। মজুমদার ডাক শুনেই উঠে বসেছে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে সায়েব ম্যাডামের ঘরের দরজায়, চাপা গলায় বলল, ইয়েস স্যার, কিছু বলছেন? হাঁ হাঁ, বলছি তো সিওর, তুমি দরজায় থাকবে মজুমদার, কেউ যদি চলে আসে। জড়ানো গলায় বলে ভার্গব। নেশায় টলটল করছিল ঘরের নারী-পুরুষ, চাপা গলায়

হাসছিল শ্রেয়া চৌধুরী, ওহ্, ডিয়ার, হোয়াট আর য়্যু ডুয়িং, লেট হিম গো।

কথাটা কানে আসতে মজুমদার সাহস পেয়ে বলেছিল, আসবে না স্যার, নো ওয়ান ইজ পারমিটেড টু কাম হেয়ার নাউ।

আয় নো ইট মজুমদার, লেকিন তুম রহোগে, বাহারমে খাড়া হো।

আমি পাশের ঘরে আছি স্যার, আপনারা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন।

নো মজুমদার, ওপেন থাকবে ডোর, তুমি গার্ড দেবে।

নো ভার্গব, ক্লোজ দ্য ডোর। চাপা গলায় বলল শ্রেয়া চৌধুরী।

নো, ইট্স মাই অর্ডার, য়্যু আর গোয়িং টু গেট দ্য পাওয়ার অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সি হাও দ্য পাওয়ার ক্যান বি এনজয়েড, ডার্লিং, মেরা পাওয়ার তো টু হানড্রেড হর্স পাওয়ার, গেট রেডি।

ওহ্, মেরে জান, প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর, মজুমদারকে সরিয়ে দাও।

নো সুইটি, মজুমদার গার্ড দেবে, হি ইজ আ লয়াল অফিসার, সে জানে কীভাবে অর্ডার ক্যারি-আউট করতে হয়।

মাই লাভ, প্লিই-ই-জ।

নো সুইটি।

তুমকো করনাই হোগা ভার্গব, ইয়ে মেরা অর্ডার, গো অ্যান্ড ক্লোজ দ্য ডোর, আয় নিড আ প্রাইভেসি।

হা-হা করে হাসে ভার্গব, বলে, তুমি তো মল্লিক সাহাবের রিলেটিভ হচ্ছো, পাওয়ার তোমার আঙ্কেল ভালো বোঝে, বাট, আওয়ার ডিএম একটা ইডিয়ট, না হলে তোমাকে ইন্টারভিউর টিপস নিতে আমার কাছে পাঠায়, আমি তোমাকে খেয়ে নেব। বলতে বলতে ভার্গব ওঠে, তার পায়ের চটির ফটফট শুনতে পায় মজুমদার। দম বন্ধ করে

অপেক্ষা করে। কিন্তু ভার্গব আসে না। টয়লেটে ফ্লাশের শব্দ শোনে। ভার্গব বেরিয়েছে টয়লেট থেকে। ভার্গব আসছে দরজার দিকে। বিড়বিড় করছে, ওহ্ মজুমদার, তবু তুমি বাইরে থাকবে, চেয়ার নিয়ে দরজার বাইরে বসো, তোমার ডিউটি তুমি করবে, আমি দরওয়াজা বন্ধ করি বা না করি।

স্যার!

ক্লোজ দ্য ডোর, তুম বাহারমে ওয়েট করো মজুমদার স্যার, ডু ইট মজুমদার সাহেব। খিলখিল হাসি উড়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে, ইউ আর আ নাইস পারসন মজুমদার আঙ্কেল।

হাঁ মজুমদার, আমি চাই অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। মজুমদার আমাদের গার্ড দেবে, হি ইজ দ্য মোস্ট কমপিটেন্ট পারসন টু ডু দিজ টাইপ অব জব।

মজুমদারের একমুহূর্তের জন্য মনে হলো, ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের স্বভাবে ফিরে আসে মজুমদার। পাথরে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তখন বছর তিরিশের ভার্গব দরজায় এসে গেছে। তার অনাবৃত ফর্সা রঙের ভেতর লালচে ভাব। ছয় ফুটের ওপর লম্বা ভার্গব সায়েবের দানবের মতো শরীর। কোমরে একটি ঘন নীল রঙের ফ্রেঞ্চি। কোমরের নিচে পৌরুষ দপদপ করছিল। ভার্গবকে ওই অবস্থায় দেখে কুঁকড়ে গেল মজুমদার। মনে হলো, ভার্গব সায়েব যদি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাংলো থেকে বের করে দেয়! বিপরীত সম্ভাবনাই মনের ভেতরে জেগে উঠল। ভার্গব যদি তাকে কান ধরে ওঠবস করতে বলে পাওয়ার শো করাতে, যদি তাকে অর্ডার করে শ্রেয়া চৌধুরীর বিছানায় উঠতে, সে কি পারবে? পারবে না। ভয়ে কুঁকড়ে যাবে।

ভার্গব তাকে দেখল পর্দা সরিয়ে, চাপা গলায় বলল, গুড বয়, খাড়া রহো মজুমদার, দরওয়াজা বন্ধ করে দিচ্ছি, কোথাও যাবে না।

মজুমদার দাঁড়িয়ে থাকল। তার শীত করে এলো। ভয় করছিল। কিন্তু সে নড়ছিল না। ভার্গব খুব রাগী তরুণ। ভার্গবের কথায় না বলায় এক ডি-গ্রুপ কর্মচারীর গালে চড়। পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে কালেক্টরেটে গোলমাল হয়েছিল, কিন্তু ভার্গবের কোনো দোষ কেউ পায়নি। ক্ষমতার পাশে ক্ষমতাই থাকে। তা না হলে ক্ষমতাবান দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই কর্মচারী বদলি হয়ে গিয়েছিল দূরের ব্লকে। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার তানিয়া সেন নিজেই ছোটাছুটি করে বদলি নিয়ে চলে গেছে জেলার বাইরে। ভার্গব তার গায়ে হাত দিয়েছিল। কালেক্টরেটে গুঞ্জন উঠেও থেমে গিয়েছিল।

মজুমদার শুনতে পাচ্ছিল শীৎকার ধ্বনি। ভেতরে তখন শঙ্খ লেগেছে সাপ আর সাপিনীতে। ঝটপট আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল সেগুন কাঠের দরজা ভেদ করে। চাপা কণ্ঠস্বর, নারী কণ্ঠের প্রবল উল্লাস-ধ্বনি। পৌরুষের রোষ। পুরুষের রোষ মানে অশ্লীল শব্দ। আর সেই শব্দে কল্লোলিত হয়ে উঠছিল যুবতী। তার সুরেলা কণ্ঠেও বেজে উঠছিল পালটা রোষ। মজুমদার বিবাহিত। মজুমদার একটি কন্যার পিতা। মজুমদারের যৌবন ফুরোয়নি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর কথা সে ভাবেওনি কোনোদিন। তার তখনো নিয়মিত স্ত্রী সংসর্গ হয়। কিন্তু ওভাবে হয় কি? ওভাবে যে হতে পারে, তা সে জানল তখনই। সে বিস্মিত হয়ে কাঁপছিল। বড় সায়েব, ডিএমের কথা মনে পড়ছিল। পাওয়ার, পাওয়ার ছাড়া জীবনকে এনজয় করা যায় না মজুমদার, শুনছ।

ইয়েস স্যার।

পাওয়ারকে কখনো ফিল করেছ?

নো স্যার।

পাওয়ারকে চিনতে হয়, সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাধা...

সোনার হরিণ, সে যে তোমার কাছে ধরা দিয়েছে তা বুঝতেই তোমার জীবন কেটে যাবে মজুমদার।

ইয়েস স্যার।

পাওয়ার হলো মেয়েমানুষের মতো, তাকে ধরে রাখতে হয় মজুমদার।

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কথা বলছ না কেন মজুমদার?

বলছি তো।

সায়েবের নেশা হলে তাকে পাওয়ারের কথা শোনায়। মজুমদারের মনে হচ্ছিল, ক্ষমতার একটা রূপ সে দেখতে পাচ্ছে। বিমূর্ত ক্ষমতার আদল সে আন্দাজ করতে পারছে। ক্ষমতার নানা চেহারা, তার একটি কাছাকাছি হয়ে সে কাঁপছিল। বড় সায়েবও এই পাওয়ারকে চেনেনি। ক্ষমতার পৌরুষকে কেউ কোনোদিন ছুঁতেও পারবে বলে সন্দেহ হয়। মজুমদার নিজে তো নয়ই। তার বউটি ভয়ে উন্মাদিনী হয়ে যাবে, কেন্নোর মতো গুটিয়ে যাবে। ক্ষমতাবান ব্যতীত যৌনতাকে উপভোগ করবে কে? উপভোগ করার সাহস হবে কার? রতি-রহস্যকেও জানা যায় পাওয়ার দিয়ে। পাওয়ার ব্যতীত যৌনতা ভিজে ব্লটিং। ক্ষমতাবানের যৌনতা আর দুর্বল মানুষের যৌনতা আলাদা। যে-কোনো ক্ষমতাই আসল ক্ষমতা, তা দিয়ে বিপুল হয়ে উঠতে পারে যৌনজীবন, ভোগের জীবন। সেই সময় বনবাংলোর কর্মচারী বুড়োর বুড়িবউ বাইরে দীর্ঘ করিডোরের সিঁড়িতে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল দূর থেকে। সে দরজার গোড়া থেকে সরে এসে বড় হলঘরটি পার হয়ে মোটা কার্পেটে নিঃশব্দে হেঁটে বাইরে এলো। নেমে গেল সিঁড়ির একটি ধাপে, কপট চোখ রাঙালো। জিজ্ঞেস করল, কী চাই, এখন এখেনে কেন, বারণ করিনি?

বুড়ি হাঁ করে তাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, ময়লা আঁচলে মুখ ঢাকল, তারপর বিনবিনে গলায় বলল, হুজুর, আমার সবেবানাশ হঁই গিছে।

মজুমদার নিচে নেমে এলো, সবেবানাশের আর সময় পেলে না, পরে এসো, বেরোবার সময়।

হুজুর! বুড়ি চাপা আর্তনাদ করে ওঠে।

বড় সায়েব-ম্যাডাম রেগে যাবে, পরে এসো।

বুড়ি কেঁদে ওঠে বিনবিন শব্দে, বলল, আমার বুড়া থির হয়ে গেল হুজুর, বসে বসেই চোখ বন্ধ করল, হুজুর দেখে যাও।

হাসপাতাল নিয়ে যাও।

বুড়ি মৃদুস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করল, হুজুর, আমার বুড়া কথা বলছে না, হা ভগবান, বুড়া কথা বলতে বলতে পড়ে গেল মেঝেয়, চোখ খুলছে না।

বাংলোর পেছন দিকে অনেকটা দূরে প্রাচীরের গা-ঘেঁষে তাদের ভাঙাচোরা বাড়ি। আউট হাউসের মতো। তারা দাঁড়িয়ে বাংলোর সামনে। বাংলোকে বেড় দিয়ে ওদের বসতবাটিতে যেতে হবে। কী হলো বুড়োর? বুড়োই তো বাংলোর দরজা খুলে, ঘর পরিষ্কার করে, মুরগি কেটে রেঁধে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আগের দিন খবর দেওয়া হয়েছিল বিডিওর চৌকিদারকে দিয়ে। সবকিছু টিপটপ ছিল। বিছানার চাদর বদলানো ছিল, ঘরে ধূপ জ্বালানো ছিল, জল আর গ্লাস ছিল। সব গুছিয়ে বুড়ো অপেক্ষা করছিল সায়েবদের জন্য। তারা এসে গেলে সায়েব-ম্যাডাম তাদের জন্য রাখা সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে বুড়োই কয়েকবার ঢুকেছে এটা-ওটা নিয়ে। তারপর তাকে বলে চলে গেল। বুড়োকে আগেও অনেকবার দেখেছে মজুমদার। কথা বলে না বিশেষ। এবার তাকে দেখছিল বিস্ময়ের চোখে। বাংলোয় মেম সায়েব আর সায়েবরা ফুর্তির জন্যই

আসে। যাদের ফুর্তি তারাই আসে। তবে এই সায়েব কী করতে এলো। সে বিড়বিড় করে বলেছিল, মোরে তো চৌকিদার কহে নাই।
অবাক হয়ে মজুমদার তাকে দেখছিল, বলেছিল, এই যে বললে চৌকিদার খবর দিয়ে গেছে সকালে।
হুজুরের কথা তো কহে নাই।
কার কথা বলেছিল?
বুড়ো বলেছিল, মে' ছেলে না নিয়ে আসবে হুজুর, মোরে তা বললে আমি গাঁ থেকে আনা করতাম, বেশি দামও লাগতনি, সব বসে আছে, অভাবী ঘর সব, দুটা পয়সা হতো।
মজুমদার চুপ। বুড়ো তার দিকে ঘুরে তাকাতে তাকাতে নেমে গেল ঘণ্টাখানেক আগে। ওই সায়েব-ম্যাডাম ফুর্তি মারছে, এই সাবে করবে কী? ফুর্তি যদি না মারবে, এলো কেন? ঘরে ফিরে তার বুড়িবউকে কি ওই কথাই শোনাচ্ছিল? ছোট সায়েবের জন্য মেয়েছেলে আনতেই পারত সে, ইশ্, কী হলো এটা। একা একা লোকটা করবে কী?
কী বলছ তুমি!
হ্যাঁ হুজুর, কথা কহিতে কহিতে থির হয়ে গেল, হুজুর বুড়াকে দেখবা চলো।
হাসপাতাল নিয়ে যাও।
কী করে নি যাব হুজুর?
ভ্যানট্যান জোগাড় করে নিয়ে যাও।
হুজুর, হাসপাতাল নি যাওয়ার অবস্থা নেই, বুড়ার কী হলো হুজুর।
তখন ডাক এসেছিল ভার্গব সায়েবের, মজুমদার, কাঁহা হ্যায় মজুমদার?
দূর থেকে মজুমদার দেখতে পেয়েছিল, ভার্গব সায়েব পাকা প্রশাসকের পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। জিন্স, টি-শার্ট, সু। সে ছুটে গিয়েছিল, ইয়েস স্যার?

পাঁচ

ভার্গব বলেছিল, মজুমদার বাংলোর খাট ড্যামেজ হয়ে গেছে, নাজিরখানায় বলে নতুন এনে দিয়ো, মেঝের কার্পেটও বদলাতে হবে।

ইয়েস স্যার।

চলো, এবার ফিরতে হবে।

ভার্গবের একটু পর বেরিয়ে এলো মিস শ্রেয়া চৌধুরী। তার দিকে চেয়ে হাসে, হাই, হাউ ডিড য়্যু এনজয়? নাইস বাংলো, নাইস নাইস, থ্যাংকস, থ্যাংকস মজুমদার।

শ্রেয়ার কথায় বিগলিত হাসে মজুমদার। হাত কচলায়। শ্রেয়া তখন বলে, নাইস অফিসার, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট বয়, ভার্গব, য়্যু আর লাকি, এমনি অফিসার পেলে কোনো চিন্তা থাকে না।

ভার্গব বলে, মজুমদারকে আমি তৈরি করেছি, তোমার আক্কেল ডিএম নিয়ে নিয়েছে, লেকিন মজুমদার হামারা হ্যায়, সব কাম করে দেয়।

ওক্কে ভার্গব, মজুমদার এবার আমরা ব্যাক করব তো।

ইয়েস ম্যাডাম।

হাঁ মজুমদার, বুড়াটাকে সব মিটিয়ে দিয়েছ? ভার্গব জিজ্ঞেস করে।

ইয়েস স্যার।

কুছু বখশিশ তো দাও, হান্ড্রেড রুপিজ।

ইয়েস স্যার।

আমিও দেব ভার্গব, পে অ্যানাদার হান্ড্রেড ফর মি। ভার্গবের হাত ধরে শ্রেয়া বলল, বুড়োটা বেশ ভালো, গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডফাদার ভাব।

তখন ভার্গব বলল, বাংলোর কেয়ারটেকার গ্র্যান্ডফাদার হয় নাকি, তোমাকে নিজেকে

সকলের থেকে সেপারেট করে নিতে হবে শ্রেয়া, তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তোমার ক্লাস আলাদা, মজুমদার, টু হান্ড্রেড দিয়ে দিয়ো, আর বলো বটলে কিছুটা ওর জন্য রেখে দিলাম, তিন পেগ হয়ে যাবে, যেমন চুকচুকে চোখ বুড়ার, বটলে হাত ঘষছিল। বলল তো বটলে একটু রেখে দিতে, হাউ ফানি, আমি তাই বললাম বুড়ো চেয়েছে থাক একটু! বলে শ্রেয়া হাসল, বাংলোর বুড়োরা এমনি হয় ভার্গব, প্রসাদ পায়।

ভার্গব বলল, নাজিরখানা থেকে টাকা নিয়ে নিয়ো মজুমদার।

নাজিরখানা সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করে। এসব খরচ ওখান থেকেই হয়। নানা খাতে খরচ দেখিয়ে এসবের জন্য টাকার জোগান দিতে হয় নাজিরবাবুকে। মজুমদারের কি অজানা এসব? সে নিজেকে একটু নুইয়ে বলল, 'ইয়েস স্যার, স্যার!' তারপর মজুমদার বুড়োর কথাটা বলতে গেল, বুড়ো বোধ হয়...। বলতে পারল না। সায়েব তখন শ্রেয়া চৌধুরীকে নিয়ে বাংলোর বাইরে রাখা গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে। মজুমদার পার্স থেকে দুশো টাকা বের করে বুড়ির দিকে ছুটল। ভার্গবের অভ্যেস সে জানে। ভার্গব দেরি করবে না। ভার্গবের গাড়ি খুব জোরে ছোটে। এখন ভার্গবের গাড়িতেই যাবেন মিস চৌধুরী, শহরে ঢোকার আগে তিনি গাড়ি বদল করে মজুমদারের গাড়িতে উঠবেন। মজুমদার তখন গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াবে। মিস চৌধুরী উঠে গেলে সে উঠবে ড্রাইভারের পাশে। শহরের আগে ওই গাড়ি বদলের জায়গা অবধি মজুমদারকে অনুসরণ করতে হবে ভার্গব সায়েবের গাড়ি। ভার্গব সায়েবকে হারিয়ে ফেলা চলবে না। কারণ, নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছে ভার্গব দাঁড়াতে চাইবে না। অপেক্ষা করতে হলে সে মজুমদারের ওপর রেগে যাবে। দরকারে শ্রেয়া চৌধুরীর সামনে খিস্তি করতে আরম্ভ করবে, আরে বুদ্ধ, আমি কি তোমার জন্য ওয়েট করব মজুমদার, আমার কাজ নেই, ফাইল নিয়ে বসে আছে বড়বাবু! তুরন্ত আসতে পার না।

বুড়ির হাতে দুশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে মজুমদার ছুটল। বুড়ি তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছে, হুজুর, বুড়া মোরে ছেড়ে চলি গেল, হুজুর, বুড়া আর নাই!

তারপর কী হলো মজুমদার? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দুশো টাকায় সৎকার হয়ে যাবে, বিড়বিড় করে বলল মজুমদার, আচমকা কেঁপে ওঠে সে, টাকাটা দিয়ে ছুটেছি, পেছনে বুড়ি তখন রোখ ছেড়ে কেঁদে উঠল, এতক্ষণ সায়েবদের ভয়ে কাঁদতে পারছিল না, আমরা বেরোতে তারা যেন বাঁচল। মনে হয়েছিল, বুড়োও বোধহয় বাঁচল।

তারপর। এসব কথা আমরা কেউ জানতাম না, কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

মজুমদার বলল, সারাটা পথ আমি কাঁপতে লাগলাম বাসু, সে ছিল ভরা ভাদ্দর, পচা গরম, হাই রোডের পাশে নয়ানজুলিতে পাট পচছে, তার গন্ধ পচা ভাদুরে মেঘের মতো ভেসে আছে শূন্যে। আমি গুটিয়ে পড়ে থাকলাম গাড়ির পেছনে, অর্ধেক পথ যেতে ড্রাইভারকে বললাম, আস্তে চালাতে, আমার ভয় করছিল খুব। বুড়ো মরেছে তা ড্রাইভারও বলল। বয়স্ক ড্রাইভার কতবার কত সায়েব-মেমকে নিয়ে বাংলোয় এসেছে। বুড়োকে সে অনেকদিন ধরে চেনে, যৌবনকালে নাকি তার খুব জোশ ছিল, সায়েবদের খুব ফেভারিট ছিল, সাত পেগ খেয়েও টলত না। এক সায়েব ওর জন্য আলাদা বোতল আনত। সায়েব আর ও নেশা করত সন্ধে থেকে। সায়েবটা ভালো ছিল। নেশা করেই ওকে দোস্ত বলত। সেই সায়েবের কথা বুড়ো আজো বলল। সে ছিল একা মানুষ। কী ভালো মানুষ!... ওর বউ বিয়ের আগে কাজ করত আর এক সায়েবের বাংলোয়, সায়েব তাকে নষ্ট করে বুড়োর কাছে দিয়ে গেছিল, সেই থেকে সে বুড়োর বউ। তখন বুড়ো জোয়ান মরদ। এসব কথা ড্রাইভার বলতে বলতে স্টিয়ারিং ধরে ঢিমেতালে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। বলতে বলতে থামে মজুমদার, তারপর আবার বলে, সে যখন নির্দিষ্ট পয়েন্টে

পৌঁছায়, ভার্গব সায়েব চলে গেছেন শ্রেয়া ম্যামকে নিয়ে, ডিএম বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছেন। ভার্গব সায়েব ব্লক অফিস ভিজিটে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন শ্রেয়া ম্যাম। প্রোগ্রাম তো সেই রকম ছিল। শ্রেয়া চৌধুরী ইন্টারভিউর জন্য ওভাবেই তৈরি হচ্ছিলেন।

আমরা দুজনে চুপ। শেষে আমি বললাম, এত ভয় করতে কেন মজুমদার, তুমি তো স্টেট সার্ভিসের অফিসার, ভয়ের কী ছিল।

মজুমদার বলল, ভয়টা পারিবারিক, জেনেটিক বলা যায়, তুমি আমাকে একটা গল্প বলেছিলে, বিদেশি লেখকের, সেই এক কেরানি, কী যেন নাম?

ডেথ অব এ ক্লার্ক, আন্তন চেখভের গল্প।

আমি ওই রকম ভয় পেতাম বাসু, আর বুঝেছিলাম, আমি ওইভাবেই পাওয়ারের ছিটেফোঁটা পাব, নিচে থেকে উঠেছি প্রমোশনে প্রমোশনে, ওর কোনো দাম ছিল না সায়েবদের কাছে, তারা অবিশ্যি সব সময় প্রকৃত চাকর খুঁজত, যত খারাপ কাজ, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বাসন মাজা, টয়লেট সাফাই - সব প্রমোটিরা করবে, আমি ভয় করতাম যেমন, ভক্তিও করতাম। জানতাম গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট আসলে সায়েবদের সার্ভেন্ট, দেখেছি ভয় থেকেই আসে ভক্তি।

ভয়ে-ভক্তিতে নার্সিং হোমে ঢুকে গেলে?

আমি সেদিন সারারাত প্রায় ঘুমোইনি বাসু, বুড়োটা আচমকা মরল, তখন ওরা দুজন বাংলোর পুরনো খাট ভাঙছে ভীষণ আনন্দে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। চুপ করল মজুমদার। তারপর নিম্নস্বরে বলল, রাতভর বুড়ো আমার পাতলা ঘুমের ভেতর হানা দিতে লাগল। বুড়ো হাত কচলে কচলে বলছে, আগে যদি সে জানত হুজুর একা, সে গাঁ থেকে হুজুরের পছন্দমতো নিয়ে আসত কাউকে, ভাদ্দর মাসে অভাব খুব, তারা আসবে

বলে বসে আছে, সে বুড়ো হয়েছে, তার যৌবনকালে সায়েবের এঁটো হতে পারলে ভাগ্য ফিরে যেত, পছন্দ হলে সায়েব তার কোয়ার্টারে কাজে বহাল করত, পরে গরমেন তার চাকরি দিত। আমি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, বাসু। ভয় করছিল কেন, তা বলতে পারব না আমি। মনে হচ্ছিল, আমি তলিয়ে যাচ্ছি। ভোররাতে আমার জ্বর এলো, মাথা ছিঁড়ে যেতে লাগল।

আমরা ভেবেছিলাম, তুমি বড় সায়েবের ভয়ে নার্সিং হোমে অ্যাডমিশন নিলে। না, বুড়োটার ভয়ে।

সুনন্দা ওপর থেকে নেমে এলো, বলল, বউমা ফোন করেছিল। অনেক ফটো পোস্ট করেছে নেটে, নায়াগ্রা গেছিল ওরা।

মজুমদার বলল, কতদিন বাদে দেখা হলো ম্যাডাম বউদি, আপনারা খুব ভালো।

কেন? সুনন্দা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে।

সে আমি জানি, তা আপনি কি তারপর থেকে বাড়িতে বসে গেলেন ম্যাডাম?

সুনন্দা কথা এড়িয়ে গিয়ে বলল, মেয়েদের বাড়িই ভালো, বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাবে তারা মজুমদারদা?

আমি একটু কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কেন এসেছ মজুমদার, স্রেফ আড্ডা দিতে কি তুমি এলে। আড্ডা কোনোদিন দিয়েছ বলে তো মনে পড়ে না, সব সময় সায়েবদের গা ঘেঁষে ঘেঁষে থাকতে, সক্কাল থেকে তোমার ডিউটি শুরু হতো, সায়েবের অনুগ্রহ পেতে তোমাকে ধরত সবাই, তোমার পাওয়ারও কম ছিল না।

কথাটা গায়ে মাখে না মজুমদার। তার মুখে অচিনপুরে সেই নির্লিপ্ত হাসি দেখলাম, বলল, পাওয়ার কে না পেতে চায় বাসু, কথাটা তা নয়, আমি তোমাদের ইনভাইট করতে এসেছি, আমরা একটা জমায়েত করব, রি-ইউনিয়ন বলতে পারো বাসু, যারা

ছিল অচিনপুরে, নাইনটিন নাইনটি টু থেকে নাইনটি সিক্স, তাদের ডাকছি, সকলকে, আমাদের স্যার এমপি হয়েছেন।
স্যার মানে, কোন স্যার?
হেডস্যার! মৃদু হাসে মজুমদার, বলে, লোকনাথ মল্লিক স্যার, বড় সায়েব, রিটায়ারমেন্টের পর রাজনীতিতে নেমেছেন। দ্যাখো বাসু, আসল পাওয়ার কিন্তু অন্যখানে, রাজনীতিতে, স্যার তা রিয়ালাইজ করেছেন, আমরা স্যারকে সংবর্ধনা দেবো, ম্যাডাম বউদিকে গান গাইতে হবে, জানি না উনি এখনো গান করেন কি না।
আমি চুপ করে গেলাম। পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠতে লাগল, তা টের পেলাম। আমার মাথার দপদপানি শুরু হয়ে গেল বুঝি। আচমকা মনে হলো মজুমদারকে বলি চলে যেতে। তোমার সেই কর্তাভজা অভ্যেস এখনো গেল না, মজুমদার? তুমি তোমার মল্লিক সায়েবের বেডরুম পাহারা দাও গিয়ে, আমাদের আমাদের মতো থাকতে দাও। চাকরি শেষ হয়ে গেছে, এখন ওই লোকনাথ মল্লিক আমার কাছে কে? হু ইজ হি? তিনি কে মজুমদার?
আরে আমাদের বস মল্লিক সায়েব, ডিএম, তাঁকে আমরা সংবর্ধনা দেব।
আমার মনে পড়ছে না মজুমদার। নির্লিপ্ত স্বরে বললাম।
হা হা করে হাসল মজুমদার, বলল, কী দারুণ বললে বাসু, অচিনপুরকে ভুলে গেলে, এতক্ষণ যে গল্পটি শুনলে, সেই অচিনপুর।
ও আচ্ছা, আমি কেন যাব, তোমার কি ইন্টারেস্ট?
মজুমদার একটু সময় চুপ করে থাকে, তারপর দম নিয়ে বলে, বাসু, তোমাদের ওপর ইনজাস্টিস হয়েছিল, কিন্তু জীবনে কত রকম ইনজাস্টিসকে ফেস করতে হয়। ভুলে যাও বাসু, ভুলে যাও, আসলে তোমার কিছুই ক্ষতি হয়নি বাসু।

তুমি কী করে এলে মজুমদার, সব ভুলে গেছ?

মজুমদার বলল, আমি কিছুই ভুলিনি বাসু, আমি স্যারকে কথা দিয়েছি বাসু।

এই সেই পুরনো মজুমদার। সময় গেলে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। মজুমদার বদলায়নি। সে রিটায়ার করে গেছে। কিন্তু অভ্যেসটি আগের মতো রয়েছে। ক্ষমতাকে কুর্নিশ করতে ভালোবাসে মজুমদার। সায়েব লোকনাথ মল্লিক পাওয়ার থেকে সরে গিয়ে আবার পাওয়ারে ফিরেছেন, মজুমদার কি তাঁর ছায়ায় যেতে চাইবে না? মজুমদার বলছে, দ্যাখো বাসু, পাওয়ার কিন্তু রাজনীতিকদের হাতেই, স্যার যা বলতেন, ব্যুরোক্র্যাটরা একদিন সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নেবে, তারাই কন্ট্রোল করবে সব...।

আমি হাত তুললাম, থাক মজুমদার। আমি তো পাওয়ারের বাইরে আছি, আমার ওসবে কোনো কৌতূহল নেই।

মজুমদার বলল, আসলে সেটাই হবে, যত বেশি ব্যুরোক্র্যাট রাজনীতিতে আসবে, তত বেশি ক্ষমতা যাবে ব্যুরোক্র্যাসির হাতে।

তুমি যা-ই বলো, এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

মজুমদার বলল, বুরোক্র্যাসিই কন্ট্রোল করবে রাজনীতিকে, তারা ধীরে ধীরে সব ক্ষমতা নিয়ে নেবে।

থাক না মজুমদার।

বাসু, তিনি তোমাদের কমপেনসেট করতে চান।

আমরা তো চাই না, আমরা ক্ষতিপূরণের জন্য ধরনা দিইনি।

মজুমদার হাসল। চুপ করে থাকল। সুনন্দা উঠে গেছে আবার। মজুমদারকে দেখে চঞ্চল হয়েছে সে। তার মনের ভেতরে হয়তো পুরনো অপমানের স্মৃতি ফিরে আসছে। মজুমদার এসে ঠিক করেনি। সুনন্দার গানের গলা ছিল। কিন্তু বেশিদূর এগোতে

পারেনি। আমি জেলায় জেলায় চাকরি করেছি, সেখানে গানটা নতুন করে শো হয়নি, অফিসারদের নানা জমায়েতে গান গেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ওকে। সবাই বলত, বাহ্, দারুণ, আপনি আপনার গান নিয়ে অনেকদূর যাবেন। জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের যে-জগৎ গড়ে ওঠে, সেখানে আমার বউ সুনন্দা বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছিল। গান তাকে করতেই হতো। বাড়িতে কেউ এলেও গান শোনাতে হতো তাকে। ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে তার গান বাঁধা। রবীন্দ্র, নজরুলজয়ন্তীতে সুনন্দা ব্যতীত ছোট শহরটিতে চলে না। গান শেখাতও রোববারে। কত অনুরোধ, উপরোধে যে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে হতো তাকে, গাইতে হতো 'আজি যত তারা তব আকাশে...', সেই সময়টা আমাদের ভালো কেটেছিল অনেকদিন। আমাদের ছেলের তখন তিন বছর বয়স। তাকে ভর্তি করা হয়েছিল সেই জেলা শহরের এক নার্সারি স্কুলে। অফিসের গাড়ি তাকে নিয়ে যেত, ফিরিয়ে আনত। সুনন্দাও যেত ছেলের সঙ্গে ওই স্কুলে। সে একটা চাকরি নিয়েছিল। তাকে খুশি করার লোকের অভাব হতো না তখন। আমার হাতে এমন সব দপ্তরের ভার ছিল যে সবাই আমাকে খুশি করতে চাইত। ক্ষমতার একটা রং আছে, সেই রঙে সুখ আছে, সেই সুখ আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু তা চলেও যায় লোকনাথ মল্লিক জেলা শাসক হয়ে এলে। আমার ক্ষতি করে দিলো সাংবাদিক বন্ধু সুবিমল।

নতুন জেলা শাসক মল্লিক সায়েবের বউ গান জানেন, রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন নাকি খোদ শান্তিনিকেতনে, তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রী, এসব খবর রটে যেতে দেরি হলো না। মজুমদার নিজেই সেই কথা বলতে লাগল সবাইকে। আমাকেও বলল, খোদ শান্তিনিকেতনে শেখা, তা কি সুনন্দা বউদির মতো হবে? সকলের সামনেই কথাটা বলতে লাগল। ম্যাডামের ক্যাসেট বের করার জন্য তিনটে কোম্পানি ঘুরছে। দূরদর্শনে

তিনি কতবার গিয়েছেন। আকাশবাণীতেও।

মজুমদার জানত, ক্ষমতার দরজা কোনদিকে। কোন পথে গেলে ক্ষমতার ছায়ায় দাঁড়াতে পারবে সে? তখন সে-ও ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পাবে। সে তার ডিউটি আওয়ার্স বদলে নিয়েছিল নতুন ডিএম আসতেই। সকালে বাজার করে বাংলোয় হাজির হতো। নিচে বসে থাকত। সায়েব বা মেমসায়েব কখন ডাকবেন। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল তার ডিউটি আওয়ার্স। বাংলোর অফিসে মজুমদার পড়ে থাকত। তার এবং তার পরিবারের সুবিধে-অসুবিধে দেখত। লোকে বলত, মজুমদার এমনই ছিল কর্তাভজা যে, বললে সে কর্তাগিন্নির জামাকাপড় কেচে দিতেও পারে। কিন্তু কেন, মজুমদার কী পেয়েছিল এর পরিবর্তে? পেয়েছিল অপরিমেয় ক্ষমতা। সে অসন্তুষ্ট হলে জেলা শাসকও অসন্তুষ্ট হবেন, এটা আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। জেলা শাসকের অনুগ্রহ পেতে সে ছিল সবচেয়ে বড় খুঁটি। সেই ক্ষমতা মজুমদার এখনো ধরে রেখেছে কীভাবে, তা নিয়ে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

ছয়

এই যে মজুমদার বসে আছে নির্লিপ্ত মুখে, সে কী করেছিল আমাদের ওপর, তা আমি না ভুললেও মজুমদার ভুলেছে। ভুলে যেতে, অস্বীকার করতে সে পারঙ্গম। মান-অপমানের ধার ধারে না। লোকের কথা গায়ে মাখে না। মনের ভেতরে লুকিয়ে রেখে দেয়। সময়ে তা অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে।

নতুন জেলা শাসকের বউ শান্তিনিকেতন-ফেরত, এ-কথা জানার পর মজুমদার সুনন্দাকে বাদ দিতে লাগল সব অনুষ্ঠান থেকে। আগের জেলা শাসকের ফেয়ারওয়েলেই অচিনপুরে তার শেষ গান। সেখানে নতুন জেলা শাসক লোকনাথ

মল্লিকের স্ত্রীও ছিলেন। তিনি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান। সেই গানের বাণীতে ভুল ছিল। পরে সুনন্দা মজুমদারকে বলেছিল। তার পর গেয়েছিল সুনন্দা। সুনন্দার গলায় মধু। আগের জেলা শাসক কী প্রশংসাই না করে বিদায় নিলেন জেলা থেকে। তাতে মল্লিক সায়েবের স্ত্রী একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সুনন্দা তো গেয়েই যাচ্ছিল। মল্লিক সায়েবের স্ত্রী তাকে পছন্দ করত না, এটাও জানি। কিন্তু আমার বন্ধু সাংবাদিক সুবিমল রায় যখন জেলায় অনাহারে মৃত্যুর রিপোর্ট করল, আমি এবং সুনন্দা জেলা শাসক ও তাঁর স্ত্রীর বিষ নজরে পড়ি। বড় সায়েব পছন্দ করেন না, তাই মজুমদারও অপছন্দ করতে লাগল। জেলা উৎসব থেকে বাদ গেল সুনন্দা। মজুমদার জেলা শাসক ও তাঁর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে কোনো কিছু করতেই পিছপা হতো না। এই ঘটনা শ্রেয়া চৌধুরীর ঘটনার পরে ঘটে। জেলা উৎসবে সুনন্দা ডাক না পেয়ে অবাক। আমি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মজুমদার বলেছিল, সেই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছতে পারেনি সুনন্দা।

কোন স্ট্যান্ডার্ড?

আরে, ম্যাডামের ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে, টিভিতে তাঁর গান দেখায়, উনি তো সিলেক্টর।

কিন্তু ওর গানের গলা তো ভালো না।

কে বলল ভালো না, সবাই বলছে দারুণ, সুচিত্রা মিত্রর মতো।

দেখো মজুমদার, ওঁর গানে ভুল থাকে অনেক। আমার যেন রোখ চেপে গিয়েছিল।

মজুমদার বলল, তুমি ভুল ধরতে পারো?

সুনন্দাই বলে।

তোমার বউ গান জানে? নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করে মজুমদার।

তোমার কী মনে হয়? রাগ চেপে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

দ্যাখো, জেলা উৎসব কোনো পাড়ার ফাংশন নয় যে এলি- তেলি সবাইকে স্টেজে তুলে দেওয়া হবে, বাইরে থেকে কত লোক আসবে তখন, বদনাম হয়ে যাবে। বড় ম্যাম সমস্ত প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন, উনি যা বলবেন তা-ই হবে।

বড় ম্যাম গাইবেন?

সে উনি জানেন, উনি তো নিজেকে রাখেননি। এমপি, এমএলএ সবাই বলল, কী করবেন উনি। তারাই বলেছে ওঁকে গাইতে হবেই। সত্যিই তো, ওঁর শিল্পীসত্তা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, এমপি ওঁকে দিল্লিতে বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে নিয়ে যাবেন, মার্চের এন্ডে।

সেদিন দেখেছিলাম মজুমদারের চেহারা। যেন আমাকে আর সুনন্দাকে অপমান করতেই আমার চেম্বারে এসেছিল সে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল সে। কী রকম অনায়াস ছিল তার উচ্চারণ। বলছিল, সে অনেক চেষ্টা করেছিল সুনন্দাকে রাখতে, হতেও পারে যদি সুনন্দা একবার মিসেস মল্লিকের কাছে যায়। একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ওঁর হাতে দেয়। লোকাল আর্টিস্টদের জন্য দুপুরে একটা স্লট রাখার কথা ভাবা হচ্ছে।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ মজুমদার, থাক এসব কথা।

মজুমদার বলেছিল, তুমি মিসেসকে বলো বড় ম্যামের কাছে যেতে, আমিই নিয়ে যাব।

খুব অপমানিত লেগেছিল। আমি বলেছিলাম, ধন্যবাদ মজুমদার, কোনো প্রয়োজন নেই।

যাবে না!

না। আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, থাক এসব কথা।

উনি চাইছেন সুনন্দা বাসু ওঁকে রিকোয়েস্ট করুন।

চাইলে তো হবে না, সে যাবে না।

ম্যাম ডাকলে তো যেতে হবে বাসু।
কেন, বলো দেখি?
মজুমদার বলল, তোমার প্রয়োজনেই তোমার বউকে ম্যামের কাছে যেতে বলো।
কী প্রয়োজন? আমি বিস্মিত হয়েছি।
তুমি কি জানো না?
কী জানব? আমি আরো অবাক।
তোমার বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল ব্রেকের চার্জ আসছে, তুমি জানো না?
না, আমি কী করলাম?
মজুমদার বলল, তুমি ডিএম স্যারের কাছে যাও।
কী হয়েছে পরিষ্কার করে বলো দেখি।
তুমি কী সব মিথ্যে রিপোর্ট দিয়েছিলে তোমার রিপোর্টার বন্ধুকে, অনাহার কেস।
আমি! কে বলল?
তুমিই তো তাকে বড় সায়েবের কাছে নিয়ে এসেছিলে, সে বলে গিয়েছিল যা যা জানার সব জেনে নেবে তোমার কাছ থেকে, এনকোয়ারি হয়েছে, অনাহারের মতো কোনো ঘটনা এখেনে নেই। গাড়ির লগবুক বলছে, তুমি ওই মার্চে ধুলোপাড়ায় গিয়েছিলে, সঙ্গে ছিল তোমার ওই বন্ধু।
বুঝতে পারছিলাম সুবিমলের রিপোর্ট আমাকে বিপদে ফেলেছে। ঘটনা সত্যি। সুবিমলকে আমি জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গেছিলাম সরকারি গাড়িতে করে। এটা তো হয়েই থাকে। সুবিমল ধুলোপাড়ায় যেতে চেয়েছিল। ধুলোপাড়ার খবর সে আগে থেকেই জানত। ওই উদ্দেশ্যে যে এসেছিল, তা পরে আমার মনে হয়েছিল। ধুলোপাড়া - ট্রাইবাল গ্রাম দেখবে আমায় বলেছিল সে। আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর লিখবে। লিখেছিল

পরম সত্য, নিদারুণ অনাহারের কথা। জীর্ণ মানুষগুলোর ছবি নিয়েছিল। পত্রিকায় বেরোল ছবিসহ সেই ভয়ানক প্রতিবেদন। তারিখ উল্লেখ ছিল তার প্রতিবেদনে। গাড়ির লগবুকের সঙ্গে মিলে গেছে সেই তারিখ।

মনে হয়েছিল, মজুমদার ওই কথা নিয়েই এসেছে আমার কাছে। সুনন্দার বাদ যাওয়া ওই কারণে। মজুমদার চাইছে, আমি ডিএমের কাছে গিয়ে মার্জনা চেয়ে আসি। চিঠি বেরোনোর আগে তা হলে হয়তো আমি বেঁচে যাব। সে-ব্যবস্থা মজুমদার করবে। রিপোর্টার বন্ধুই তোমাকে ফাঁসিয়েছে, বাসু।

কথাটা অসত্য নয়। সুবিমল আমাকে বলেওনি অথচ লিখে দিলো, সুবিমল ওটা ঠিক করেনি। আমার চাকরিকে সুবিমল কি ঈর্ষা করেছিল? লিখবে ওই খবর, তা আমাকে জানায়নি কেন? জানালে আমি ওকে ডিএমের কাছে নিয়ে যেতাম না। পাওয়ারের সঙ্গে লড়ার সাধ্য কি সুবিমলের আছে? রিপোর্ট হলো, কদিন হইচই হলো, জেলা শাসক মিটিংয়ে বললেন, সরকারি তথ্য যিনি দিয়েছেন, তাঁর চাকরির বারোটা বাজিয়ে দেবেন তিনি। কী রোষ তাঁর সেই ডেভেলপমেন্ট মিটিংয়ে। আমার অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে চাকরির ক্ষতি তিনি করেছিলেন। চার্জশিট তৈরি হয়েছিল, শেষে দুটো ইনক্রিমেন্ট বাদ গেছিল। আমার বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ আনা হয়েছিল। জেলা থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। অনেকদিন লেগেছিল প্রশাসনের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে। আর সেই অনাহারের রিপোর্ট মিথ্যে বলে প্রশাসন জবাব দিয়েছিল। এনকোয়ারি করেছিল মজুমদার। বড় সায়েব যেমন চেয়েছিল, সে তেমন রিপোর্ট দিয়েছিল।

মনে আছে, এরপর সুনন্দা মরমে মরে থাকল। সে আর কোথাও যেত না। জেলা উৎসব থেকে বাদ যাওয়া তাকে দমিয়ে দিয়েছিল। সে আর আমাদের অফিসার্স ক্লাবে কখনো

গান গাইতে যায়নি। জেলা-মেলায় বাদ, জেলা শাসকের বউ তার মধুমাখা গান পছন্দ করেন না, তা জেনে তার গানের অনুরাগীর সংখ্যাও কমতে লাগল একটু একটু করে। যতদিন ছিলাম, এরপর আমার হাত থেকেও চলে যেতে লাগল ক্ষমতার দায়িত্বগুলো। মজুমদারকে আমি বললাম, সে তো নিজের জন্য গাইত।

ওঁকে গাইতে হবে এবার, কী চমৎকার গলা ওঁর, মল্লিক সায়েব খুব পছন্দ করতেন ওঁর গান। অম্লান মুখে বলল মজুমদার। সে পুরনো কথা সব ভুলে গেছে। বলছে, সায়েবরা হলেন গার্জেন, তাঁদের কথামতো চললে কোনো অসুবিধে হয় না।

আমি বললাম, ঠিক আছে মজুমদার, অচিনপুর থেকে আসার পর সুনন্দা আর কখনো কোথাও গান শোনায় না।

তা বললে হবে দাদা, সব কথা মনে রাখতে নেই। বউদি তো আসলে ভালো গাইতেন, মল্লিক সায়েব বলেছেন ওঁর কথা। তিনি বউদিকে মনে রেখেছেন এখনো, অচিনপুর বলতেই বড় ম্যাডামের গান, তারপর বউদির গান, আপনার বক্তৃতা, অনিকেত সান্যালের আবৃত্তি, প্রবীর রায়ের অভিনয় - সব মনে রেখেছেন, আমরা ওকে সংবর্ধনা দেব শুনে কী খুশি, বলেছেন সবাইকে হাজির করতে। প্রবীর রায় বেঁচে নেই শুনে কী দুঃখ করতে লাগলেন, গ্রেট ম্যান উনি, না হলে আমাদের কথা এমনভাবে মনে রাখতে পারেন।

সুনন্দা নেমে এলো চা নিয়ে। বসল হাসিমুখে, তারপর প্রস্তাব শুনে তার মুখে কালো পোঁচ পড়ল, বলল, স্যরি, মজুমদারদা, আমি গান ছেড়ে দিয়েছি, এখন যা হবে সব বেসুরো।

তাই-ই হবে ম্যাম, আপনি বেসুরো গাইতে পারেন না। সম্বোধন বারবার বদলে দিচ্ছে মজুমদার। আমার মনে পড়ছে, সুনন্দাকে জেলা উৎসব থেকে বাদ দিয়ে মজুমদারের

সেই ভঙ্গি। সব ভুলে গেছে মজুমদার। সায়েব আমার চাকরির ক্ষতি করে দিলেন তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা-ও। সে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। ডিএম যেমন বলেছিল, ঠিক তেমন লিখেছিল। কী করে এলো মজুমদার এই কথা নিয়ে?

আমি তো জানি কী হবে, আপনারা আর কাউকে ঠিক করুন। সুনন্দা তীক্ষ্ম গলায় বলল।

ঠিক তো হয়েই গেছে, লোকনাথ মল্লিক সায়েবই বলে দিয়েছেন, উনি এমপি, ওঁর ইচ্ছাই তো শেষ কথা।

সুনন্দা বলল, না, কত বড় বড় গায়ক আছেন, উনি বললেই তাঁরা চলে আসবেন।

সে তো জানি ম্যাম, কতজন ওঁর কাছে ঘুরঘুর করে, এই যে বিদেশে বঙ্গ-উৎসব হয়, উনি প্রায় সব কটির অ্যাডভাইজার, শুধু কি সিঙ্গার, রাইটার, অ্যাক্টর সবাই ওঁর কাছে অবলাইজড, সকলে ওঁর পিছু পিছু ঘোরে, আর উনি যে কতজনকে বিদেশ ঘুরিয়ে এনেছেন।

মজুমদারের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না সুনন্দা। অচিনপুরের কথা এখনো মনে পুষে রেখেছে। জেলা উৎসব থেকে বাদ দিয়ে এই লোকটা কী অনায়াসে বলে দিয়েছিল, হার হাইনেস শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করা, গানও ওখানে শেখা, তাঁর ডিসিশনই ফাইনাল। লিস্ট তিনি করেছেন, তার মতো কে পারবে? কেউ না। ডিএমের বউকে যে হার হাইনেস বলতে হয়, তা মজুমদারই জানিয়েছিল প্রথম। ম্যাডাম মল্লিকের গাওয়া গানে রবীন্দ্রনাথের বাণীর ভুল পরিবেশন হচ্ছে, সুনন্দার তা বলা ঠিক হয়নি মজুমদারের কাছে। মজুমদার তা বলে দিয়েছিল বড় ম্যাডামের কাছে। বলে আরো বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল জেলা শাসকের স্ত্রীর কাছে। জেলা শাসকের কাছেও। তার ক্ষমতাও বাড়ল তখন।

কিন্তু এই মজুমদারই তো অনেকদিন পরে আমার জমি পাওয়ায় সুবিধে করে দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ বাসু, বেঁচে থাকা একটা লড়াই, কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয় না। আমি যা করেছি, প্রয়োজনে করেছি, এখনো তাই-ই করছি। হ্যাঁ, তোমার জমি আমি বের করে দেব, বিনিময়ে কিছুই নেব না, সব হলো ম্যাডামের জন্য, উনি অচিনপুর থেকে মন খারাপ করে ফিরেছিলেন। মজুমদার দুঃখ প্রকাশ করেছিল। একটা জীবন। ব্যাপ্তি এর বছর পঁয়তিরিশ, চাকরিজীবন তো ওইটুকুই। জীবন ভোগের সময়ও ওইটুকু। এই সময়ের যত ক্ষমতা, আর সেই ক্ষমতার নানা রকম রূপ-আস্বাদ। প্রয়োজনে ব্যবহার। জেলায় জেলায় ভ্রমণ। সম্পদ অর্জন, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া - সব।

মজুমদার বলল, ওটা আমার অভ্যাস ছিল ম্যাডাম, আমি আমার বসকে সন্তুষ্ট করতে সবকিছু করতে পারি, করা উচিত। করলে সার্ভিস লাইফ ভালো হয়, আপনি চলুন, স্যার সকলকে সস্ত্রীক যেতে বলেছেন।

উনি কি এখনো আপনার বস?

বলতেই পারেন ম্যাডাম, বস তো বসই। এখন তিনি এমপি, মোর পাওয়ারফুল।

স্যরি, আমি যেতে পারছি না, আমার গান আমার ছেলের জন্য, বউমার জন্য। গান গেয়ে গেয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতাম, এখন তারা বিদেশে, আমার কিছুই ভালো লাগে না, কবে আমার নাতনিকে ঘুম পাড়াব গান গেয়ে গেয়ে, সেই দিন গুনছি।

সুনন্দা গেল না। আমাকে যেতে হলো সুনন্দার জন্য। দেখে এসো, শুনিয়ে এসো আমাদের অভিমত। জানতাম, শোনানো যাবে না, এমপি মানে অনেক জনবল। তাঁর কথায় এখানে যারা আছে, তাঁর পার্টির আমাকে তারা বিব্রত করতে পারে। লোকনাথ মল্লিক তাঁর পাওয়ার হারাতে রাজি নন। তাই তো এমপি হওয়া।

সাত

সায়েবের ডাকে যেতে হলো কৌতূহল মেটাতে। আর কিছু না হোক, সেই জাহ্নবী নদীর কূলের অচিনপুর নামের শহরটিকে স্মরণ করা হবে। আমাদের যৌবনকালের শহর আর নদী। নদীটি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শহরটিকে বেড় দিয়ে রেখেছিল প্রায়। এসেছিল বাংলাদেশ থেকে, অচিনপুর ছুঁয়ে জাহ্নবী আবার ঢুকে গিয়েছিল বাংলাদেশে।

ছোট এক এয়ারকন্ডিশনড হলে অনুষ্ঠান। দেখা হলো কত পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে। তাদের অনেকে রিটায়ার করে গেছে আমার মতো। কারো কারো চাকরি রয়েছে এখনো বছর দেড়-দুই। বস এলেন সস্ত্রীক। তিনি মঞ্চে বসে একটি তালিকা খুললেন। হাজিরা খাতা ধরে নাম ডাকতে লাগলেন।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করতে লাগল। আমি দেখতে লাগলাম, সেইসব যুবক এখন বার্ধক্য নিয়ে বসে আছে। আমি হাত তুললাম, আছি স্যার।

সুনন্দা আসেনি শুনে তিনি বললেন, উচিত ছিল আসা, তিনি তো অচিনপুরের গায়িকা। আপনাদের ম্যাডামের গলা নষ্ট হয়ে গেছে, তিনি আর গাইতে পারেন না, শি ইজ সাফারিং ফ্রম আ সিরিয়াস ডিজিজ। তার জায়গাটা কে নেবে, মিসেস বোসই গাইবেন ঠিক ছিল। কী মজুমদার, তুমি বললে নিয়ে আসবে, পারলে না, সবাইকে আনতে পেরেছ, পারোনি তো?

মজুমদার মাথা চুলকোতে লাগল আগের মতো। বলল, ডেপুটিরা সব এসেছে স্যার, অচিনপুরে আপনার সময় নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ছিল সান্যাল, ওই যে স্যার। ডিফালকেশন কেস থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে?

সান্যাল মাথা নামিয়ে নেয়। এত বছর বাদে তার বউয়ের সামনে না বললেই হতো। কিন্তু অনেকে হে-হে করে হাসতে লাগল। তাতে স্যার খুবই খুশি হলেন। মজুমদার

বলল, গুণধর মন্ডলকে সেভ করলেন স্যার, মনে আছে তার কথা?
এসেছে?
না স্যার, মন্ডল এখন সিঙ্গাপুরে।
কাকে নিয়ে গেল আবার চাকরি দেওয়ার নাম করে? বলতে বলতে হাসতে লাগলেন বড় সায়েব। তেত্রিশ বছর আগের জেলা শাসক, কতজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন মনে আছে? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস এলো না যে, ভেবেছিলাম ওঁকে লানডানের বঙ্গ সম্মেলনে পাঠাব, মজুমদার তো যাবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে।
কী রকম পাথরের মতো বসে আছেন বড় ম্যাডাম। তিনি বসেই থাকলেন। একটি কথাও বললেন না। তাঁর রূপ ঝরে গেছে একেবারে। বুড়ি হয়ে গেছেন। স্যার আর ম্যাডামকে অনেক উপহার দেওয়া হলো অচিনপুরের প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে। ম্যাডাম শেষে দুটি কথা বললেন, আমি সুনন্দা বসুর গান শুনতে এসেছিলাম, ওঁকে বাদ দিয়েছিলাম, ওঁকে আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম।
কী ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর তাঁর। বোঝা গেল অসুখটা কী। তিনি আবার বললেন, অচিনপুর বড় সুন্দর ছিল, বড় নিষ্ঠুরও ছিল, তাই না?
সকলে চুপচাপ। কেমন মনখারাপের বাতাস উড়ে এলো দূর উত্তর থেকে। সেই জাহ্নবী নদীর কূল থেকে। আমার মনে পড়তে লাগল সব। কী নিষ্ঠুর অহংকারী না ছিলেন ম্যাডাম মল্লিক। তাঁর ফাই-ফরমাশ খাটত কীভাবে আমাদের মজুমদার। গানের আসর, সাহিত্যের আসর বসাতে বসাতে হিমশিম। কলকাতা থেকে বড় কবি-গায়ককে নিয়ে গিয়ে তাদের হাত-পা টেপাই ছিল যেন মজুমদারের কাজ। ম্যাডাম বললেই হলো। মনে পড়ল তাঁর সেই কঠিন দৃষ্টি। সুনন্দা না গেলেও ম্যাডামের ডাকা কবিতা পাঠ, গানের

আসরে আমাকে যেতে হতো। কত দূরে পড়ে আছি। যত সময় স্বস্তিতে থাকা যায়। ডিএম সায়েবের চেয়ে ম্যাডামের প্রতাপ সব জায়গায় বেশি। শোনা যায়, আগের জেলা বীরভূমে একজনের চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিলেন তিনি ডিএম সায়েবকে দিয়ে। সেই তিনি কেমন স্থির হয়ে বসে আছেন। শান্ত দৃষ্টি। আজ ফিরেও তাকাচ্ছেন না মজুমদারের দিকে। ফিরে তাকাচ্ছেন না বত্রিশ বছর পেছনে। মজুমদার তাঁকে প্রায় কুর্নিশ করল। তিনি দেখেও দেখলেন না।

আমার কানে মজুমদার গুনগুন করল, সুনন্দা ম্যাডামকে লন্ডন পাঠাতেন ওঁরা, এতবার আসতে বললাম, চান্স চলে যায়নি এখনো, তুমি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করো ম্যাডামকে নিয়ে, বঙ্গ সম্মেলন বলে কথা।

আমি চুপ করে আছি, জবাব দিলাম না। হ্যাঁ, জেলা উৎসবের সঙ্গে ওঁর তফাৎ কী, এখনো সিলেক্ট করে যাচ্ছেন, ক্ষমতা যায়নি। শরীর গেছে কিন্তু ক্ষমতা আছে। ওঁর জন্য সুনন্দা গানই বন্ধ করে দিলো বলা যায়, এখন আর কেন, অনুগ্রহ নেবে কেন ও?

মজুমদার আবার বলল, এঁদের কিন্তু অনেক ক্ষমতা, এখনো সেই আগের মতোই যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। গুণধর মন্ডল কত বড় অন্যায় করেছিল বলো, চাকরি দেওয়ার নাম করে মেয়েটাকে নিয়ে হিলির ডাকবাংলোয়, তার গায়ে হাতই পড়ল না, অথচ এফআইআর করেছিল মেয়েটার বাবা, বড় ম্যাডামই গুণধরকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমি চুপ করে থাকলাম। সবটা আমার জানা। ওই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম আমি। তার কারণ, ধুলোপাড়া আর সুবিমল। এখন মনে হচ্ছে, যা হয়েছিল বেশ হয়েছিল। সরকার - প্রশাসন অস্বীকার করলে কী হবে, ধুলোপাড়ায় চাল-গম যেতে শুরু করেছিল। তখন এত টেলিভিশন চ্যানেলের দাপট ছিল না, তাহলে প্রশাসন কিছুই লুকোতে পারত না। ওই সংবাদ বেরোনোর পর ধুলোপাড়ায় আর কোনো সংস্থাকে,

এনজিওকে যেতে দেওয়া হতো না। কোনো সংবাদপত্রের কেউ যেতে পারেনি। পার্টির লোক তাদের রীতিমতো সন্ত্রস্ত করে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু সাড়া পড়ে যাওয়ায় ধুলোপাড়ার দিকে নজর পড়েছিল প্রশাসনের।

সুনন্দা আসুন, তা বারবার বলে দিয়েছিলেন স্যার। বড় ম্যাডাম তা-ই চান, সব মনে আছে ওঁদের। যার এসিআর খারাপ দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছিলেন, সেই মানস কুন্ডুর খোঁজ করছিলেন, কমপেনসেট করবেন বলে। আমার ক্ষতিও করেছিলেন, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ তুললেন না। ম্যাডাম তাঁর স্থির দুই চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ করেছিলেন। ওসবের কোনো ক্ষতি পূরণ হয়? আমি বিনবিন করে বললাম মজুমদারকে। মজুমদার চুপ।

তখন একজন আবৃত্তি করছেন, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া অনিকেত সান্যাল। গলার সেই মাধুর্য আর নেই। অল্প বয়সে করত। তারপর ওসবের কাছে নেই। কিন্তু ম্যাডামের কথায় তাঁকে করতে হলো, তা বললেন বারবার। আবেগে অনিকেত সান্যাল আপ্লুত।

মঞ্চ থেকে মল্লিক স্যার আমাকে বললেন, মিসেসকে নিয়ে কবে আসবেন?

কোথায় স্যার?

আমাদের লেক টেরাসের ফ্ল্যাটে, আপনাদের ম্যাডাম ওঁর গান শুনবেন, বঙ্গ সম্মেলনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

আমি বললাম, বলতে পারছি না স্যার, আমরা থার্ড উইকে সান দিয়েগো ক্যালিফোর্নিয়া যেতে পারি, এর ভেতর সময় হবে না।

বলতে বলতে আমি দেখি বড় ম্যাডামের দুটি চোখ জ্বলে উঠল যেন। তিনি অনুগ্রহ বিলোতে এসে ব্যর্থ হয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। মজুমদার উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, আমিই নিয়ে যাব স্যার, আমার ওপর ভার থাকল।

এরপর যেন সুর কেটে গেল। আমি বেরিয়ে পড়েছি একা। কাউকে কিছু না বলেই চলে এসেছি। পথে একবার মোবাইল বাজল, ধরিনি। বোধহয় মজুমদার। বাড়ি ফিরে দেখি, সুনন্দা ইন্টারনেট খুলে গুনগুন করছে, 'ছোট্ট পাখি চন্দনা! ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা! একটি শিসে জাগিয়ে দিলো লাগছে তাও মন্দ না।'

কাকে শোনাচ্ছ?

একটা বুড়োকে, ব্যাঙ্গালুরুর থেকে একশ কিলোমিটার দূরে, গাঁয়ে থাকে, ফেসবুকে আলাপ।

ফেসবুক, তুমি করো?

সুনন্দা হাসল। কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে। মনিটরে এক সন্ন্যাসীর মতো মানুষের মুখ। চমকে উঠি, কে তিনি? সুবীর ভদ্র? মেজমাসির বড় ছেলে? সুনন্দা তাকে চিনল কীভাবে? কত বয়স হবে তাঁর এখন? সত্তর ছুঁয়ে গেল বোধহয়। একেবারে মেসোর মতো লাগছে।

সুনন্দা বলল, ফেসবুকে চেনা দরকার হয় না, আলাপ হয়ে যায়। বউমা ওখানে বসে বানিয়ে দিয়েছে আমার জন্য, আমি সবদিন সন্ধেয় ওঁর সঙ্গে কথা বলি, উনি বহু দেশ ঘুরে এদেশের গাঁয়ের লোকের চিকিৎসা করছেন, কত বয়স, সাধুর মতো হয়ে গেছেন, আমরা কী করলাম সারাজীবনে? দাঁড়াও গানটা শুনিয়ে দিই, কতদিন বাদে গাইছি! দানা বাঁধছে একটু একটু করে। একেবারে সেই অল্প বয়সের গলা যেন ফিরে এসেছে। স্পিকার থেকে তারিফের বাক্য শুনতে পাচ্ছি। কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। সুবীরদা একা নয়, অনেক শিশু রয়েছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ঘর ভরে উঠেছে বিপুল উল্লাসে। আমি যে সায়েবদের কথা, ম্যাডামের কথা বলব, কী রকম ছোট লাগল নিজেকে। চুপ করে থাকলাম। গান থামিয়ে সুনন্দা আমাকে ডাকে, এসো, ডা. সুবীর ভদ্রের সঙ্গে আলাপ

করো, ভালো লাগবে, যাবে ওঁর ওখানে, সেই সত্যিকারের অচিনপুরে। দ্যাখো, উনি কী লিখেছেন, জাহ্নবী নদী আর অচিনপুর ওখানে, আমরা তাহলে কোথায় ছিলাম গো, জাল অচিনপুরে, ফেক অচিনপুরে?
আমি চুপ করে আছি। সুনন্দা বলছে, পাওয়ার কাকে বলে দেখো, তোমাদের ওইসব ভয়ংকর ক্ষমতার চেয়ে এই ক্ষমতা কি কম? কত মানুষ ওঁকে ভালোবেসেছে ওখানে। এর নাম কি ক্ষমতা নয়? এই ক্ষমতা কত মধুর, তা কি কেউ জানে বসুবাবু?